যত্ত তুমি যে বাজারে যাইতেছ" ? প্রত্যুত্তরে যুবক কহিল "মহাশয় আমি দরিদ্র এই তৈল বিক্রয় না হইলে আমার পরিবার চালান ভার হইবে, ঈশ্বর যাহাকে পরিবার চালানর ভার দিয়াছেন, সেই জানে একার্য্য কত কঠিন! আপনি আমোদ করিতেছেন, ভাবিয়া দেখুন দেখি, সময়ে সময়ে রাজ্যের বিষয় আপনার মনে উঠিতেছে কি না "? যুবকের এই নীতি পূর্ণ বাক্য শুনিয়া, রঘুনন্দন ভাবিলেন, কালে এই যুবক একদিন গণ্য ব্যক্তি হইবে। রঘুনন্দন তখন যুবককে কহিলেন "শুন দয়ারাম তুমি এ ব্যবসা পরিত্যাগ কর, আমি তোমাকে মাসিক কিছু নির্দ্দিষ্ট বেতন দিব, তুমি আমার সরকারে কার্য্যে নিযুক্ত হও"। তদবধি দয়ারাম নাটোর রাজ বাটীর একজন সামান্য পরিচারক পদে নিযুক্ত হইল। রঘুনন্দন স্বয়ং যে প্রকার সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির পথে উঠিয়াছিলেন, দয়ারামকে তদ্রূপ করাইবার জন্য লেখা পড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন, প্রাপ্ত বয়সে দয়ারাম কষ্ট স্বীকার করিয়া সহিষ্ণুতা- বলে বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। আগুন যেমন ভস্মে আবৃত থাকে না দয়ারামের ভাগ্যও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। একদিন রঘুনন্দন, তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা দেখিয়া তাহাকে ভাণ্ডারের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, তদবধি "দয়ারাম ভাঁড়ারী" নাম হইল। কিন্তু উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নামেরও পরিবর্ত্তন হইল।

রাজসাহীর কতকগুলি কুচক্রী, রঘুনন্দনের পরম শত্রু মুরসিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দির নিকট রঘুনন্দনের নামে জানাইল যে "আজ কয়েক বৎসর বিনা রাজস্বে রঘুনন্দন বাওয়ান্ন লক্ষ টাকা জমীদারির উপসত্ব ভোগ করিতেছে" এই কথায় নবাব, রঘুনন্দনের জমীদারির হিসাব চাহিয়া পাঠাইলেন। তখন নাটোর রাজবাটীতে যেন সহসা বজ্রপাত হইল। নবাবের হুকুম হইয়াছে যে সপ্তাহ মধ্যে জমীদারির হিসাব না দিতে পারিলে জমীদারী বাজেয়াপ্ত ও রাজাকে বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইবে। রঘুনন্দনের উপায়ান্তর নাই। সমস্ত কর্ম্মচারীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহই সাহস করিয়া এই বিশাল হিসাব পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইল না। তখন রঘুনন্দন হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। সেই সময় দয়ারাম সম্মুখে আসিয়া যোড় করে কহিল "প্রভুর আদেশ হয় তো এদাস মুরসিদাবাদের নবাব দরবারে রাজ্যের বিশাল হিসাব পরিষ্কার করিয়া আসিতে পারে।" দয়ারামের এই কথায় রঘুনন্দন আশ্বাসিত হইয়া নাটোর রাজবাটীর দেওয়ান স্বরূপ তাহাকে মুরসিদাবাদে পাঠাইলেন। তখন দয়ারাম বাওয়ান্ন লক্ষ টাকার এক বিশাল হিসাব প্রস্তুত করিয়া নবাবের নিকট উপস্থিত করিলেন। সত্য মিথ্যা বিশ্বাস হয় না শুনিয়াছি ১৬ টাকা পটলের সের ৩২ টাকা পানের পন, একমন সন্দেশ প্রত্যহ জল খাইবার" ইত্যাদিরূপ অসম্ভব হিসাব সেই ফর্দে লিখিত ছিল। নবাব তাহা দেখিয়া বিস্মিত হওয়াতে দয়ারাম কহিয়াছিলেন "খোদাবন্দ! যাঁহারা আপনার প্রতিনিধি সাধারণ লোকের খাদ্যের সঙ্গে কি তাহাদের খাদ্য তুলনা করা

যায়!" এই কথায় নবাব আশ্বস্ত হইলেন। তৎকালীক মুসলমান নবাব, ও ওমরাওগণ বিষয় সম্বন্ধে প্রায়ই ঐরূপ হস্তীমূর্খ ছিলেন। যাহা হউক এইরূপে দয়ারাম, নবাবকে রঘুনন্দনের হিসাব বুঝাইয়া দিলেন। রঘুনন্দন অনেকাংশে নিরাপদ হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার চক্রান্তকারীরা আবার ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এক দিন প্রাতঃকালে দয়ারাম গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন যে, রঘুনন্দনের নামে আবার নবাব দরবার হইতে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। তখন কাননগোর নিকট দয়ারাম শুনিয়াছিলেন যে রঘুনন্দন রাজ বিদ্রোহী তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। এই হুকুম প্রচারের কথা শুনিয়া কূট বুদ্ধি দয়ারাম কৌশল জাল বিস্তার করিলেন। শুনিয়াছি তিনটী সুপক্ক আম্রফল পরম যত্নে সজ্জিত করিয়া নবাবের নিকট গিয়া উপস্থিত করিলেন। নবাব অতি যত্নে সেই ভেট গ্রহণ করিলেন। মালদহ জেলা রঘুনন্দনের রাজ্যের একাংশভুক্ত ছিল। এই জন্য আম্র প্রভৃতি নবাবের ভেট যাইত নবাবও পরম যত্নে গ্রহণ করিতেন। দয়ারামের প্রেরিত আম্র তিনটী সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অম্লত্ব প্রযুক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দয়ারামকে গ্রেপ্তার করিবার অনুমতি প্রচার করিলেন। শুনিয়াছি তখন দয়ারাম রায় গদগদ কণ্ঠে নবাবকে কহিলেন "ধর্ম্মাবতার আমি এ বিষয়ে দোষী নাই কেননা আমাদের মহারাণী বাটীর মধ্যে একটী আম্রের কলমের চারা যোগাইয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ তাহাতে পাঁচটী আম্র ধরিয়াছিল। তাহাই মহারাণী অম্ল কিম্বা মিষ্ট না জানিয়া, একটী তাঁহার স্থাপিত বিগ্রহকে, এবং আর তিনটী আপনি দেশের রাজা আপনাকে দিয়া অপরটী নিজে রাখিয়াছেন। আপনাদের অগ্রে না হইলে তো আর তিনি অগ্রে খাইতে পারেন না। কারণ তাঁহার স্থাপিত বিগ্রহ ও আপনি মহারাণীর পূজ্য।" তোষামোদপ্রিয় নবাব এই কথায় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনন্দনকে এক প্রশংসাপত্র ও দয়ারামকে "রায়" উপাধি প্রদান করিলেন। তদবধি দয়ারাম রায় নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। অদ্যাপিও তাঁহার বংশীয়েরা "রায়" উপাধিতে বিখ্যাত। এইরূপ বিষয়বুদ্ধির মিথ্যা জাল বিস্তার করিয়া দয়ারাম রায়, প্রভু রঘুনন্দনকে নবাবের কোপ হইতে রক্ষা করিলেন। রঘুনন্দন দয়ারামের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নাটোর জমীদারির প্রতিভূ স্বরূপ নবাব দরবারে রক্ষা করিলেন। এইরূপে দয়ারামের ভাগ্য উত্তরোত্তর প্রসন্ন হইতে লাগিল। এদিকে রঘুনন্দনের জীবন বায়ু বহির্গত হইল, তখন তাঁহার ভ্রাতা রামজীবন, রাজ উপাধি ধারণ করিয়া নাটোর জমীদারি আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিলেন। রামজীবনের রাজত্ব কালীন নাটোর জমীদারি সম্বন্ধে মুরসিদাবাদে কোন চক্রান্তকারী ছিল না; সুতরাং দয়ারামকে আর মুরসিদাবাদে থাকতে হইল না। তখন তিনি নাটোর বাস করিতে লাগিলেন। রামজীবন দয়ারামের বুদ্ধি ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না এমন কি মৃত্যু সময়

তাঁহার একমাত্র বালক রামকান্তকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই হইতেই দয়ারাম নাটোর রাজবাটীর একমাত্র কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। রামকান্তের বাল্যাবস্থায় দয়ারাম, মুরসিদাবাদ হইতে যশোহরের বীর সীতারামকে গ্রেপ্তার করিতে যান। রামকান্ত দয়ারামকে "দাদা, দাদা" বলিয়া ডাকিতেন এই জন্য পুণ্যহৃদয়া রাণী ভবানী দয়ারামকে "ভাসুর ঠাকুর" বলিয়া ডাকিতেন। শুনিয়াছি রাজা রামকান্ত বিলাসী হইলে দয়ারাম একদিন রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন ও একদিন রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। রামকান্তের বাল্যাবস্থায় দয়ারামই লগ্নপত্র স্থির করিয়া রামকান্তের সহিত রাণীভবানীর বিবাহ দেন। প্রমাণ স্বরূপ একটী জনপ্রবাদ আছে রাণীর কন্যা তারাদেবী যৎকালে যশোহর জমীদারীতে বাস করিতেন, তখন এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মত্র বাজেয়াপ্ত করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা দয়ারামের নিকট কান্দিয়া পড়িলে, দয়ারাম রাণীর নিকট কহিয়াছিলেন "মা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র গুলি ছাড়িয়া দাও" প্রত্যুত্তরে রাণী ভবানী কহিয়াছিলেন যে "আপনি নাবালকের অলিরক্ষক ছিলেন, বিষয় হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা তো আপনার নাই সেই জন্যই আপনার প্রদত্ত ব্রহ্মত্র বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।" এই কথায় দয়ারাম কহিয়াছিলেন "ওমা তাহলে যে তুমি কেউ নও বিবাহের লগ্নপত্র আছে।" এই কথায় রাণী ভবানী তারাদেবীকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন "মা তারা, এ বৃদ্ধ বয়সে আমার বিবাহটী অসিদ্ধ করিও না; ব্রহ্মত্রগুলি ছাড়িয়া দাও।"

দয়ারাম সীতারামকে গ্রেপ্তার করিয়া নলদী পরগণা রামকান্তের নামে জমীদারী সন্থে নাম পত্তন করিয়া, রামকান্তের অধঃপতনের সময়, তরপ কাউল কাল্‌না এবং নিজের নামে নাম পত্তন করিয়া লইয়াছিলেন। নাটোরের অনেকানেক মৌজা ও চাক্‌লা নিজের নামে কায়েমী মৌরসী করিয়া লইয়াছিলেন। দয়ারাম রাণীর প্রদত্ত দীঘাপতিয়ার নূতন বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত রাণী ভবানীর প্রতিনিধি অভিভাবকের স্বরূপ দীঘাপতিয়ায় থাকিয়া কার্য্য করিতেন। নাটোরে তখন আর একজন দেওয়ান ছিলেন। ইনিই নড়াল জমাদার বংশের আদি পুরুষ। দয়ারামের পৌত্র প্রাণনাথ রায় জমীদারি করিয়া বংশের ক্রমিক উন্নতি করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ দয়ারাম তখন রাণী ভবানীর সহিত হিন্দুর মহাতীর্থ ৺ কাশীধামে বাস করিতেছিলেন।

দয়ারামের বংশে যাঁহারা অদ্যাপিও রাজসাহী প্রদেশে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারাও এখন নিতান্ত হীন ভাবে নহেন। আজ প্রায় দেড় বৎসর গত হইল মহারাজ প্রমথনাথ রায় বাহাদুর এই বংশে চারিটী পুত্র রাখিয়া কালকবলে পতিত হইয়াছেন। এইখানে বলা আবশ্যক বিষয় বুদ্ধি বিস্তার ভিন্ন দয়ারামরায় কোন স্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান নাই। কেবল মাত্র তাঁহার জন্মভূমি নেপাল দিঘি গ্রামে "বরদেশ্বরী" নামে একটী দেবীমূর্ত্তি ও একটী জলাশয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

মঙ্গল-গীতি। *

ঘন বিজন বিপিন, বিভু, মগন তব ধ্যানে
রোধি নিশোয়াস-গতি যোগিবর-বেশে। ১
সুধু শিশির বিন্দুশত ঝরয়ে অবিরামে
প্রেমভর-গলিতচিত-দরদরিত ধারা। ২
কল বিহগপাঁতি কত স্বর-লহরী ঢালয়ে
মাতি বিভু তব মধুর মঙ্গল-সুগীতে। ৩
প্রতি সরসি ফুল্ল ফুল স্নিগ্ধতর সৌরভে
মধুর উপহার ধরে প্রেমময় মানসে। ৪
বল্লি সুকুমারী রচি স্তবকময় অঞ্জলি
গুল্ম-বধূ অমল ফুল ফুটায়ে হৃদি গোপনে, ৫
প্রৌঢ়তরু ঊর্দ্ধশিরে ধরি কুসুম-মালা
নিজ শকতিরূপ সবে যতনে উপহারে। ৬
উদিল নব রাগভরে অহ! তরুণ ভানু, তব
হে সহজ-সুন্দর! বর অঙ্গ-আভা! ৭
বিবিধ ফুল পরিমলে ভরয়ে ভবধাম যবে,
ভাবি বিভু বরবপু সুবাসভর সঙ্করে। ৮
ধায় অবিরামগতি শত শত প্রবাহিণী
সিঞ্চি করুণায় তব তপত ভব বক্ষে। ৯
অতি তৃষিত আঁখি যুগে যত যতই হেরি হে
হেরি সুধু তব করুণা ঢল ঢল প্রবাহে। ১০
জয় জগত-স্বামি, জগজীব দুখহারী
জয় জয় অগাধ সুখ-জ্ঞান-ঘন রূপ হে। ১১

শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

---

* এই প্রবন্ধে অধিকাংশ পদই স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘতানুসারে পাঠ করিতে হইবে।

ব্রহ্মরাজ থীবো।

ব্রহ্মদেশ ব্রিটিস সিংহের পদতলে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধে ইংরাজদের বিজয় ও ব্রহ্মদেশাধিকারের পর যে স্বাধীন খণ্ডটুকু অবশিষ্ট ছিল যাহার উত্তরের সীমা চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব্বের সীমা সায়াম রাজ্য, যাহা এতদিন থীবো রাজার শাসনাধীন ছিল, তাহাও এইক্ষণে ইংরাজদের করতলন্যস্ত। থীবো সিংহাসনচ্যুত ও স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। এখন রাখেন রাখিবেন মারেন মারিবেন ব্রিটিস রাজ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। ইচ্ছা হয় এক পুত্তল-রাজা সিংহাসনে বসাইয়া রেজিডেন্টের হস্তে শাসন ভার দিয়া রাজ্য চালাইবেন অথবা সে ভানটুকুও বজায় না রাখিয়া দক্ষিণার্দ্ধের ন্যায় রীতিমত ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত করিয়া লইবেন।

ব্রহ্মদেশের এই দুই ভাগের মধ্যে চলাচলের পথ উত্তর দক্ষিণ বাহিনী ইরাবতী নদী। ঐ দেশের প্রধান প্রধান সহর নগর এই নদীর উপর স্থাপিত। ইহা ব্রিটিস বর্ম্মার শস্যক্ষেত্র সকল প্লাবিত করিয়া গঙ্গার ন্যায় ত্রিকোণ আকারে শত সহস্রধারে ভারত সাগরে আসিয়া মিলিত হইতেছে।

স্বাধীন ব্রহ্মের রাজধানী মণ্ডলা। পূর্ব্বে তাহার রাজধানী আভা ছিল—তাহার পর অমরাপুরী। ১৮৫৭ অব্দে রাজার খেয়ালক্রমে অমরাপুরী পরিত্যক্ত হইয়া মণ্ডলায় রাজধানী উঠিয়া গেল। রঙ্গুণ হইতে মণ্ডলা ৪ দিনের জল পথ।

ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট থীবোর নিকট যে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার প্রত্যুত্তর না পাইয়া সেনাপতি যুদ্ধযাত্রা আদেশ করিলেন। রণতরী নোঙড় উঠাইয়া ষ্টীম করিয়া আভাভিমুখে ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। আভার এখন পূর্ব্বকার পুরশ্রী কিছুই নাই। প্রাচীন ভাগ জঙ্গল পূর্ণ—নব্য ভাগও কতকগুলি পর্ণকুটীরের সমষ্টি ভিন্ন কিছুই নহে। এই স্থানে দুর্গ বন্ধনের আকার দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে লোকেরা বিনা-যুদ্ধে ইংরাজ আততায়ীদিগকে সহজে প্রবেশ করিতে দিবে না। কেল্লা আক্রমণের জন্য ইংরাজদের দিকে সকলি প্রস্তুত।

রণতরী প্রাতঃকাল ৯৷৹ ঘণ্টার সময় আভার উপকূলে আসিয়া উপস্থিত, দূরবীক্ষণ দিয়া দেখা গেল কেল্লা লোক জনে সমাকীর্ণ, তাহার মধ্যে কতকগুলি স্বর্ণছত্র সূর্য্যকিরণে ঝক ঝক করিতেছে, তাহা হইতে এই সঙ্গে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের অধিষ্ঠা সূচিত হইল। কিন্তু যুদ্ধের আ[illegible] সফল হইল না। রণতরী তীরের সমীপবর্ত্তী হইলে দেখা গেল ক্লিয়োপআর বিখ্যাত নৌকার ন্যায় এক সুসজ্জিত নৌকা জাহাজের দিকে আসিতেছে। তাহার সম্মুখ, পশ্চাৎভাগ ও দুইপার্শ্ব স্বর্ণমণ্ডিত, দাঁড়ের অগ্রভাগও সুবর্ণময় ৬০ জন দাঁড়ী পরিচালক। সেই নৌ-বাহক স্বর্ণছত্রধারী রাজপুরুষ যুদ্ধবিরামের জন্য আবেদন

করিতে আসিয়াছেন। সেনাপতি উত্তর করিলেন তাহা কখনই হইবার নয়—হয় ব্রিটিস রাজের শরণাপন্ন হও নয় এখনি কেল্লা আক্রমণ করা হইবে। একথায় কোন উত্তর না আসাতে কামান সকল দুর্গাভিমুখে সজ্জিত হইতে লাগিল এমন সময় এক টেলিগ্রামে রাজাজ্ঞা আসিল যে ইংরাজ সৈন্য বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করা হয়। ব্রিটিস সেনাপতির আদেশানুসারে কার্য্য করা হয়।

বেলা সাড়ে ৩ টার সময় কতকগুলি ইংরাজ সেনা গঙ্গায় নামিয়া কেল্লা দখল করিল। বিনা যুদ্ধে আভা ব্রিটিসের হস্তগত হইল। এইরূপ সরল উপক্রমণিকা হইতে যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

এই গেল ২৭এ নবম্বরের ঘটনা। পরদিন বেলা ১০টার সময় ব্রিটিস রণতরী মণ্ডলায় আসিয়া নোঙড় করিল। মাঝে মাঝে যদিও নৌকাদি ডুবাইয়া নদীতে নৌচালনের প্রতিবন্ধক ঘটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহা কার্য্যকর হয় নাই—ষ্টীমারের গম্য পথ উন্মুক্ত ছিল বিশেষ কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। পূর্ব্ব দিনে ঢাক পিটাইয়া এক জনরব উঠান হইয়াছিল যে ইংরাজদের ৩টা ষ্টীমার মারা গিয়াছে ও কয়েকটা গ্রেফতার হইয়াছে। ব্রিটিস রণতরীদৃষ্টে দর্শক মণ্ডলী হয়ত ভাবিয়া থাকিবে এই বুঝি বন্দীকৃত ষ্টীমার গুলি ধরিয়া আনা হইতেছে। তাহাদের এই ভ্রম শীঘ্রই ঘুরিয়া গেল। তিন জন ইউরোপীয়ান বর্ম্মা-পোনি পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া এই ভীড়ের মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়া সংবাদ আনিল যে ইউরোপীয় বাসন্দাগণ নিরাপদে কালযাপন করিতেছেন, তাঁহাদের কোন বিপদ আশঙ্কা নাই, থীবো অভয়দান করিয়া তাঁহাদের রক্ষার্থে সুবিহিত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। রণতরী যে স্থানে অবস্থিত তথা হইতে পুরীর মধ্যভাগ দৃষ্ট হয় না—কষ্টম হৌস ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি কুটীর মাত্র দেখা যাইতেছে। তীর দেশ লোকে লোকারণ্য। এ দিকে যেমন এক এক ষ্টীমার আসিয়া জুটিতেছে লোকসংখ্যা তেমনি ক্রমিক বৃদ্ধি হইতেছে। তাহারা যুদ্ধ করিবার আশয়ে আগত হয় নাই—আক্রমণের অস্ত্র শস্ত্র তাহাদের হস্তে নাই—তাহারা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কেবল তামাসা দেখিবার জন্য আসিয়াছে—মগ, চীন, হিন্দু মুসলমান এই জনতার অন্তর্গত। পুরবাসীগণ ব্রিটিস সৈন্য দর্শনে কৌতূহলে নিক্রান্ত হইয়াছে কিন্তু রাজবাটীর কোন ব্যক্তির ঠিকানা নাই। সেনাপতির আগমন যে রাজদরবারে সূচিত হইয়াছে তাহার কোন চিহ্ন নাই—রাজার নিকট হইতে কোন মন্ত্রী কিম্বা চর আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। কর্ণল স্লেডন মন্ত্রী কেনউন মেঙ্গাই-এর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ও বলিয়া পাঠাইলেন শীঘ্র আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর আর রাজাকেও সঙ্গে করিয়া আনিলে ভাল হয়। রাজবাটীতে সৈন্য প্রেরণের অনুমতি হইয়াছে।

দেড়টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কেনউন মেঙ্গাইএর কোন প্রত্যুত্তর না আসাতে

সেনাপতি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মণ্ডলাপুরী চৌকোণ, চতুর্দ্দিক প্রাকার-বেষ্টিত। প্রাচীরের বাহিরে ১০০ ফীট চৌড়া এক জলপূর্ণ নর্দ্দামা, মধ্যে ময়দান। প্রত্যেক প্রাচীর-মুখে তিনটি করিয়া দ্বার। রাজবাটী পুরীর মধ্যভাগে প্রস্তরময় প্রাচীর-বেষ্টনে সুরক্ষিত। গৃহাবলির মধ্য হইতে এক সপ্তস্তর উচ্চ স্তম্ভ দূর হইতে জননেত্র আকর্ষণ করে।

সেনাদল বাদ্যোদ্যম করিয়া নিশান উড়াইয়া উৎসাহের সহিত যাত্রা করিতেছে। পথে লোকেরা ইতস্ততঃ একত্রিত কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায় না—দিব্য আরামে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে সৈন্যদের প্রতি ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া আছে।

সেনাপতি পূর্ব্ব তোরণ হইতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার প্রবেশের কিছু পূর্ব্বে কেন-উন মেঙ্গাই হস্তী পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত। কর্ণল সাহেবকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া প্রার্থনা করিলেন যেন তিনি একাকী গমন করেন—সঙ্গে সৈন্য প্রেরণ করা না হয়। সেনাপতি সম্মত হইলেন ও পূর্ব্ব তোরণে নামিয়া কর্ণলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কর্ণল রাজবাটীতে রাজদর্শনে চলিলেন। এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল।

ব্রহ্মরাজ সমক্ষে পাদুকা পিনদ্ধ ইউরোপীয়দের এই প্রথম পদার্পণ। সেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ নরপতি বিনীতভাবে সজল নয়নে কর্ণল সাহেবের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের কথা বার্ত্তার ফল এই দাঁড়াইল যে থীবো ধনপ্রাণ সকলি একান্তচিত্তে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলিলেন আর আমার রাজত্ব করিবার সাধ নাই। কর্ণল রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার সময় মন্ত্রীগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু সে বিষয়ে তিনি কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। এই মাত্র বলা হইল যে যাহা দেশের মঙ্গলের জন্য কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় সেইরূপে কার্য্য করা হইবে।

সেনাপতি রাজ তোরণে অপেক্ষা করিতে ছিলেন ঘণ্টাখানেক পরে কর্ণল স্লেডন আসিয়া তাঁহার সমস্ত আতঙ্ক দূর করিলেন। পরে তিনি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রাসাদ অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন।

নবম্বর ২৯—আজ রাজার রাজ্যত্যাগ ঘোষণার দিন। প্রত্যূষে জনরব উঠিল রাজবাটীতে গোলযোগের আশঙ্কা। রাজাকে বন্দী করিয়া সুরক্ষিত করা সাব্যস্ত হইল। রাজা, তাঁহার এক রাণী ও রাণীমাতা সমেত এক ক্ষুদ্র কাষ্ঠ মণ্ডপে আনীত হইলেন ও চারিদিকে সিপাই সান্ত্রী পাহারা রক্ষিত হইল। রাজাকে বলা হইল ষ্টীমারে করিয়া তাঁহাকে রঙ্গুণে যাইতে হইবে সেখানে ভাইসরয় সাহেবের আদেশানুযায়ী যথাকর্ত্তব্য সাধিত হইবে। রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ কাষ্ঠ গৃহে বন্দী রহিলেন। ইত্যবসরে সেনাপতি

প্রাসাদে গিয়া মন্ত্রীবৃন্দ একত্রিত করত তাঁহাদের লইয়া বন্দীশালায় সমাগত হইলেন। রাজা বারান্দার এক কার্পেটের উপর সমাসীন—তাঁহার চৌকী পাহারা তথা হইতে কিছু দূর। এক রঙ্গীণ রেশমের ধুতি, এক সাদা মলমলের জ্যাকেট ও শিরোপরি এক রেশমের রুমাল এই তাঁর পরিচ্ছদ। তাঁহার মুখশ্রীতে নিষ্ঠুর ক্রূর ভাব প্রকাশ পায় না। থীবো যে নৃশংস দুষ্ট চরিত্র রাজকুল হন্তারক বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহার চেহারাতে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। দেখিতে হৃষ্ট পুষ্ট শান্ত মূর্ত্তি—স্থূল ওষ্ঠের উপর ঈষৎ গুম্ফ রেখা দেখা দিতেছে—গাল ফুলোর দরুণ চক্ষুদ্বয় আরো ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হইতেছে—কালে যেন কপোল-চর্ম্মে নেত্র আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে।

কর্ণল স্লেডন সেনাপতিকে রাজার সহিত পরিচিত করিয়া দিলে রাজা অল্প মাথা হেঁট করিয়া সেলাম করিলেন—সেনাপতিও তাহার প্রতিদান করিলেন। মন্ত্রীগণ অমনি ভূমিষ্ঠ হইয়া গড় করিল আর আর সকলে, চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা কর্ণলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে দুই তিন দিনের অবসর যাচ্ঞা করিলেন। সেনাপতি তাহাতে সম্মত হইলেন না—বলিলেন দশ মিনিট অবসর, তাহার মধ্যে প্রস্তুত হইতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে রাজার পার্শ্বে তাঁহার রাণী ও রাণীমাতা আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

১০ মিনিট দেড় ঘণ্টায় পরিণত হইল। দেড় ঘণ্টার মধ্যে রাজা নির্ব্বাসনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বাক্স ও জিনিসপত্র লইয়া যাইবার জন্য ১০০ জন কুলী নিযুক্ত ও রাজা রাণীদ্বয়ের জন্য দুই গরুর গাড়ী পূর্ব্ব দ্বারে প্রস্তুত, থীবো দুই রাণীর হাত ধরিয়া ও অনুচর বর্গে পরিবৃত হইয়া আস্তে আস্তে দ্বার পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেত ছত্র ধারণ করিয়া বাহকেরা সঙ্গে চলিয়াছে। বাহিরে সমবেত প্রজাগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ হইল ও অনেকে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। রাজা ও রাণীদ্বয় শাম্র গাড়ীতে চড়িয়া গৃহত্যাগী হইয়া চলিলেন। প্রজাদের ক্রন্দন-ধ্বনি রণবাদ্যে অভিভূত হইল। যখন রাজা নদীতীরে পৌঁছিলেন তখন অন্ধকার। শ্বেত হস্তীশ্বর দুই তিন সামান্য দীপালোকে আস্তে আস্তে গিয়া ষ্টীমারে উঠিলেন। ব্রহ্মরাজ্য ইংরাজদের হস্তগত হইল।

থীবো ও কর্ণল স্লেডনের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হই-য়াছে। তিনি বলেন রাজবংশ হত্যাকাণ্ডের আমি কিছুই জানি না। সকল শেষ হইলে পর তাহা আমার কর্ণগোচর হয়। রাজা যখন কাষ্ঠগৃহে বন্দী ছিলেন তখন টাইম্‌সের সংবাদদাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও আলাপ পরিচয় হয়। থীবো বলেন "আমি ইংরাজদের হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি। আর আমি কিছুই চাহি না। স্লেডন এখন রাজ্য শাসন করুণ—তিনি থাকিলে এ যুদ্ধ ঘটিত না। আমার মন্ত্রীরা অসৎ পরামর্শ দিয়াছে। ছেলেবেলায় ধরিয়া আমাকে পুতুলের মত রাখা হইয়াছে।

টনেডা ও আর সকলে আমার যুদ্ধে প্ররোচনা দিল আর যখন যুদ্ধারম্ভ হইল আগে-ভাগে তাহারাই আমাকে ছাড়িয়া পালাইল। আমার মন্ত্রীরা ভারি কৃতঘ্ন—ইংরাজদের আসা অবধি তাহারা একজনও আমার কাছে নাই।" পরে দ্বিভাষীর প্রতি ফিরিয়া রাজা বলিলেন "ওঁকে বল পরশু ৩০০ দাসী আমার পরিচর্য্যায় রত ছিল কাল তাহার ষোল জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল।"

এই ঘটনার পর ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে ডাকাতি লুট পাঠ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এই সকল বিপ্লব আঙ্গ্লোশাক্সন উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সমক্ষে টিকিবার নহে। যাঁহাদের শাসনে পিণ্ডারীদের উপদ্রব দমন হইয়াছে—ঠগী ডাকাতী নিরস্ত হইয়া ভারতবর্ষ শান্তি-সলিলে নিমগ্ন হইয়াছে তাঁহাদের চেষ্টা এদিকেও অব্যর্থ হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এখন ব্রহ্মদেশে কিরূপ শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় তাহার অপেক্ষায় আমরা সকলে সোৎসুক অন্তঃকরণে চাহিয়া আছি।

পুনশ্চ। এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেল বর্ম্মা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য আদেশ আসিয়াছে। বর্ম্মা এখন ব্রিটিশ সিংহের জঠরানলে আহুতি-স্বরূপ উৎসৃষ্ট হইল—বোঝার উপরে শাকের আঁটি পড়িল। কিন্তু একটি প্রবাদ আছে, সেটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—অবিশ্রাম তৃণগুচ্ছ চাপাইতে চাপাইতে অবশেষে শেষ তৃণ খণ্ডের ভারেই উষ্ট্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়।

নদীয়া-ভ্রমণ।

এই তিন মাসে নদীয়াজেলার অনেক স্থান আমায় ঘুরিয়া দেখিতে হয়েছে। তার মধ্যে তিনটী জায়গা বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

প্রথম পলাসী। পলাসীর যুদ্ধ মোট আজ ১২৯ বৎসর মাত্র হইয়াছে—ইতিহাসের পক্ষে সে আর ক'টা দিন? কিন্তু এর মধ্যেই জাহ্নবী দেবী সে সমরক্ষেত্রে কতক কতক পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন। ইতিহাসে আমরা পড়িয়া থাকি যে পলাসী ক্ষেত্রে গঙ্গা দক্ষিণ বাহিনী—কিন্তু এখন দেখি তিনি পশ্চিমে অনুরাগিনী। সে পুরাতন খাত আপনার অস্থি পঞ্জর লইয়া পড়িয়া আছে, বর্ষাকালে দিনকতক তার পূর্ব্বস্মৃতি উথলিয়া উঠে। সে যেমনই হউক, ক্লাইভ বা মীরমদনের প্রেতাত্মা এ পলাসীকে সে পলাসী বলিয়া চিনিতে পারুন আর না পারুন, যুদ্ধক্ষেত্রটুকু নিজে বাস্তবিক সমান পড়িয়া আছে। এত বড় মাঠ বাঙ্গালার আর আছে কি না সন্দেহ। চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে। অতি কঠিন মৃত্তিকা, ঘাসও ভাল জন্মে না, কদাচিৎ দুই চারি খানা রবি শস্যের ক্ষেত্র মরুভূমের মধ্যে হরিৎ ক্ষেত্রের মত পড়িয়া আছে। মাঠের মাঝামাঝি মুরশাদাবাদের

সদর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তার উত্তরে কিছু দূরে সিরাজুদ্দৌলার বুরুজ, দেখিলে মাটীর স্তূপ এখনও দেখা যায়। দক্ষিণে ইংরেজদের বুরুজ এর চেয়ে স্পষ্টতর, অন্ততঃ হাজার বিঘা জমী তার অন্তর্গত। প্রহরীর দাঁড়াইবার স্থান সাধারণ বুরুজ অপেক্ষা এখনও উচ্চতর, তার উপর বেলগাছের বন হইয়া রহিয়াছে। এই বুরুজের ভিতর ছোট রকমের একখানি গণ্ডগ্রাম ৩০ বৎসর হইল বসিয়াছে, নাম তার তেজ নগর। গ্রাম খানির একটু বিশেষত্ব এই যে শুদ্ধই এখানে হিন্দুর বাস—নীচ শ্রেণীর হিন্দু বটে, কিন্তু তবু হিন্দু,—মুসলমান এক ঘরও নাই। সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এই স্থানে একটী ছোট রকমের সুন্দর মনুমেণ্ট প্রস্তুত করাইয়াছেন, তাতে লেখা আছে, Plassey, erected by the Bengal government 1883 দুঃখের বিষয় ইহার মধ্যেই ঝড়ে ইহার কতক পড়িয়া গিয়াছে। এইখানে লক্ষ আঁব গাছের বাগান ছিল, ইংরেজেরা যাকে বলেন mangoe grove এখনও লোকে বলে নবাবের লাক্ষাবাগ। প্রান্তরের পূর্ব্ব সীমানায় আর একখানি নূতন গ্রাম দেখিলাম, তার নাম জানকী নগর। এই গ্রামের মণ্ডল আমায় বলিল যে তার এক আত্মায়ের এক শত বৎসরের উপর বয়স হইয়াছিল। মরিবার আগে বুড়ী গননা করিত যে যুদ্ধের সময় তাহার বয়স ৯।১০ বৎসর। লাক্ষাবাগে তারা আঁব কুড়াইতে যাইত। যুদ্ধের সময় অনেক গাছ কাটিয়া ফেলা হয়। একটী গাছ অবশিষ্ট ছিল, ৫।৬ বৎসর হইল মরিয়া গিয়াছে। ইংরেজ মুসলমান যুদ্ধের শেষ ভগ্ন দূত সেই, সম্মুখ যুদ্ধের চিহ্ণ স্বরূপ তার শরীরে অনেক অস্ত্র লেখা ছিল, অনেকেই দেখিয়াছেন। শুনিলাম তার কাঠে সিন্দুক প্রস্তুত করাইয়া মহেশ নগরের কুঠির একজন সাহেব মহারাণী ভারতেশ্বরীর কাছে উপহার পাঠাইয়া ছিলেন। অনেক যত্নে আমিও তার ছোট একখণ্ড কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

লাক্ষাবাগের শ্মশান ক্ষেত্রের উপর ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের জয় চিহ্ণ শোভা পাইতেছে—নিকটেই কয়টী নূতন গাছ জন্মিয়াছে। এক অশ্বত্থ গাছের নীচে এক ফকীর কুটীরে বাস করে, তার আস্তানার সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি মাটীর ছোট ছোট ঘোড়া। ফকীর বলে সেই অশ্বত্থ গাছের নীচে নবাবের হাবলদার বীরপুরুষের কবর। মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাঝে মাঝে অনেক "জোয়ান পুরুষের" অস্থি এই সব স্থানে পাওয়া যায়, অনেকেই বলিল। গোলাগুলিও সময়ে সময়ে পাওয়া যায়। সাহেবেরা এখানে বেড়াইতে আসিলে পরম যত্নে সে সব সংগ্রহ করেন। আমি সাহেব নহি তথাপি কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। সাহেবিআনার এই দারুণ দুর্গতির দিনে ভরসা করি আমার এ বেয়াদবি টুকুর তত খবর লওয়া হইবে না। সেই জড়ময় দারু এবং লৌহ পিণ্ড দেখিতে দেখিতে স্বজাতিপ্রেমী ইংরেজের হৃদয় উথলিয়া উঠে, আমাদের কি কিছুই হয় না?

আমার একজন বিলাত ফেরৎ বন্ধু বলিয়াছিলেন যে খাঁটি ইংরেজের চরিত্রে একটী

সামঞ্জস্য আছে—তিনি যেমন কাজের লোক, তেমনি আবার ভাবের লোক। এদিকে দেখিবে, ব্যবসাদার ইংরেজ হা অর্থ যো অর্থ করিয়া রাত্রি দিন শশব্যস্ত, কিন্তু সেই আবার সেক্সপীয়রের ধাত্রীর প্রতিমূর্ত্তি কিনিবার জন্য দশ হাজার টাকা অনায়াসে খরচ করিতে পারে। পলাসী ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সে কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। ভাবিয়া দেখিলাম, এদেশে আসিয়া ইংরেজ জাতি সে সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলেন—কাজের ভাব টুকুই তাঁর স্ফূর্ত্তিলাভ করে। কই কজন ইংরেজ সখ্ করিয়া পলাসী ক্ষেত্র দেখিতে আসেন? সে সখ্টুকু থাকিলে কলিকাতার গড়ের মাঠের মত এখানেও ক্লাইভ সাহেবের প্রস্তরমূর্ত্তি রক্ষিত হইত, এ বুরুজ দিনে দিনে মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যাইত না—সংক্ষেপে পলাসীক্ষেত্র সাহেবদের তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হইত!

মাঠ হইতে গ্রাম পলাসী দক্ষিণদিকে আধ মাইল মাত্র দূরে। অতি পুরাতন পল্লী-গ্রাম। অধিবাসীরা বলিল যে, যুদ্ধের সময় হইতেই গ্রামের দুর্দ্দশার আরম্ভ। সেই সময়ে ভয়ে সকলেই পলাইয়া গিয়াছিল, যুদ্ধের পর যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহা-দের বংশধরেরাই এখন এখানে বাস করিতেছে। গ্রামবাসীদের মুখে দুই একটা গান শুনিলাম—গান না ছড়া, শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন। এই ছড়া বাগান যুদ্ধের পর হইতে এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা চরকা কাটিতে কাটিতে গাইত। এখন সে প্রথা লুপ্ত হইয়াছে, কাজেই গান গুলিও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না।

কি হলোরে জান।
পলাসীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
ছোট ছোট তেলেঙ্গা গুলি লাল কুর্ত্তিগায়।
হাঁটু গেড়ে মারবে তীর মীর মদনের গায়॥
কি হলোরে জান।
পলাসীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে।
একলা মীরমদন সাহেব কত নেবে সয়ে॥
কি হলোরে জান। ইত্যাদি
হস্তী শালে হস্তী কাঁদে ঘোড়ায় খায় না পানি॥
... ...
কি হলোরে জান ইত্যাদি।
খাস বাগে মল নবাব, ফুল বাগে মাটী।
কলকাতায় বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী॥
কি হলোরে জান। ইত্যাদি।

সহজেই বুঝা যায়, এই গানের কতকাংশ লোপ পাইয়াছে। ইহার কতক পাই পলাশীতে কতক জানকী নগরে। একজন লক্ষ্ণৌ ঠুংরিতে আমায় গাইয়া শুনাইয়া দিল—

আয় যরদেছে আপ্ লাসছে ফুলে না ফলে হাম্।
যব্ সবজি রোঁদে রুক্তি হ্যায় রোকে নীচে হাম্॥

সে বলিল, এ গান সিরাজদ্দৌলার শেষ উক্তি। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। আমি শুনিয়াছি, লক্ষ্ণৌ ঠুংরি সে দিনকার স্বর—লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ইহার স্বষ্টিকর্ত্তা।

মীর মদনের নাম এ অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে। তাঁহার বীরত্বের কথা বলিতে দেখিলাম একাধিক ব্যক্তির চোকে জল আসিল। পলাসী ক্ষেত্রের প্রায় ৮ মাইল উত্তরে মাঙ্গন পাড়া গ্রামে এই বীর পুরুষের সমাধি মন্দির। সে স্থান এ অঞ্চলের মুসলমানদের তীর্থক্ষেত্র হইয়া আছে। পলাসী গ্রামের নকড়ি মণ্ডল যুদ্ধের অনেক খবর রাখে, সে আমার সঙ্গে সঙ্গে সেরাজুদ্দৌলার বুরুজ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া মীর মদনের গৌরব কাহিনী বলিতে গিয়া সে যে হৃদয়োচ্ছ্বাস দেখাইয়াছিল, তাহা কখন ভুলিবার নহে। তখন আমায় মনে হইয়াছিল—"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডুবে পাথারে।"

নকড়ি মণ্ডল শুধুই যে ভাবের লোক এমন নহে। তাহার "কেজো ভাব"টাও সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ জাগিয়া উঠিয়াছিল! সে বলে যে যত হাকিম লোক আসেন, সকলকেই আমি যুদ্ধের খবর বলি! কোম্পানি বাহাদুরের কাছে আমার কিছু দাওয়া আছে কি না—কি বলেন ইহার? আমি এ জন্য কিছু মাসহারা অবশ্য পেতে পারি!"

শিবনিবাস। এই স্থান ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেসন হইতে ৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। অতি সুন্দর স্থান। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহার স্থাপয়িতা। ভারতচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন,—

"তুল্য কাশী, শিব নিবাসী
ধন্য নদী কঙ্কণা।

এই নদী কঙ্কনা শিব নিবাসের তিন দিক বেড়িয়াছে। এখানে রাজার একটী প্রাসাদ ছিল, এখন তাহার ভগ্নাবস্থা, কয়টী মন্দির আছে, তাহাদের একটু পরিচয় আবশ্যক। মন্দির দ্বারে যে শ্লোক আছে, তাহাতে জানা যায় যে ১৬৮৪ শকে অর্থাৎ পলাসী যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্ব্বে উহার স্থাপনা হইয়াছিল। সর্ব্ব শুদ্ধ তিনটী মাত্র মন্দির। যেটী সকলের চেয়ে বড় তার নাম রাজরাজেশ্বরের মন্দির। রাজরাজেশ্বর অতি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি—কাশীতেও এত বড় শিবলিঙ্গ আছে কিনা সন্দেহ। মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ এই যে এখনকার বৈজ্ঞানিক প্রথামত উহার মধ্যে শব্দ নিয়মিত করার ব্যবস্থা আছে—সাধারণ মন্দিরের মত কথায় কথায় শত প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলেনা। আমি গাহিলাম "ধন্য নদী কঙ্কনা"—মন্দির মধ্যে একটু মাত্র ভিন্ন স্বরে কে উত্তর দিল, "ধন্য

নদী কঙ্কণা।” মন্দিরের দ্বার কাষ্ঠে নির্ম্মিত—উই লাগিয়া নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে, নহিলে প্রতিধ্বনিতে কোনই বিকৃতি ঘটিত না। আর এক মন্দিরে রাম সীতার অতি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি—কাল পাথরের রাম, সীতা মূর্ত্তি পিত্তলময়ী। আর ভগ্ন রাজ প্রসাদের কাছে জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপ তলে আনন্দময়ীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। কালের মলায় সে সহাস্যমুখে কালিমা পড়ে নাই। মূর্ত্তিগুলি যেন কোন কুশলী ভাস্কর আজিকালি খোদিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মন্দির তিনটীর ভিতর এখনও প্রায় নূতন বোধ হয়, কিন্তু বাহিরে জীর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এমন সুন্দর কীর্ত্তি অযত্নে লোপ পাইতেছে ইহা বড় দুঃখের বিষয়!

রাজরাজেশ্বরের চূড়ায় টীয়া পাখীরা পরম সুখে বিচরণ করিতেছে। এই টীয়া পাখীদের একটু বিশেষত্ব আছে—তাহারা নাকি বড় সুন্দর পড়ে। কথাটা শুনিয়া আমার ভারতচন্দ্র এবং গোপাল ভাঁড়কে যুগপৎ মনে পড়িয়া গিয়াছিল। কঙ্কণা নদীর দেখিলাম কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ক্ষুদ্র সুন্দর নদীটী—ভারতচন্দ্রের ভাল লাগিবারই কথা। এখনও সে কুলু কুলু গান গাহিয়া আপন মনে চলিয়াছে।

বল্লাল দীঘি। এইস্থান নবদ্বীপের উত্তরে ৫ মাইল দূরে। বল্লাল দীঘি নামে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার কঙ্কাল এখানে আছে—বর্ষাকালে ভিন্ন তাহাতে জল থাকে না। দীর্ঘিকার পূর্ব্বধারে লোকের বাস। তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম অনেক পুরাতন বৃক্ষ দীর্ঘিকার ধারে ছিল তাঁহারাই দেখিয়াছেন। বল্লাল দীঘির মধ্যে দেখিবার জিনিস “বল্লালের ঢিবি।” দীর্ঘিকা হইতে উহা একটু তফাৎ। এই “ঢিবি” ক্ষুদ্র শৈলখণ্ডের মত উচ্চ। ইষ্টক, প্রস্তর এবং মাটীতে রচিত। লোকে বলে বল্লাল সেনের প্রাসাদের ভিত্তি এই। এক বৃদ্ধ মুসলমান গল্প করিল যে বাল্যকালে তাহারা এই ঢিবির উপর অনেক আঁব কাঁঠালের গাছ দেখিত। ঢিবি হইতে চারিদিকের দৃশ্য বড় মনোহর দেখায়। পূর্ব্বে খড়িয়া নদী, পশ্চিমে ভাগীরথী নবদ্বীপের কাছে আসিয়া সঙ্গত হইয়াছে দেখা যায়। স্পষ্ট বুঝা যায়, এই ত্রিবেণী পূর্ব্বে বল্লাল ঢিবির পদতলে বহিয়া যাইত কালধর্ম্মে আজ প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। ইহা সত্য হইলে অনেক কথা পরিষ্কার হইয়া আসে। ভাল এই ঢিবি যদি বল্লাল সেনের প্রাসাদ ভিত্তি, তবে ইহা এত উচ্চ কেন? আমার মনে এরূপ প্রশ্ন স্বতঃই উঠিয়াছিল। প্রাচীনেরা বলিলেন যে বেশী দিনের কথা নয়, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গা বল্লাল দীঘির অনেকটা কাছে ছিলেন। তার পর মনে করুন, গৌরাঙ্গের জন্মস্থান নবদ্বীপ চারিশত বৎসরে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে পুরাতন নবদ্বীপ আজ গঙ্গাগর্ভে—পূর্ব্বপারের নবদ্বীপ এখন পশ্চিমধারে বিরাজমান। সুতরাং একদিন যে ভাগীরথী এবং খড়িয়ার মিলিত উর্ম্মিরাজি এই বল্লাল ঢিবির নীচে আসিয়া প্রহত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব "বল্লাল ঢিপি" বাঙ্গালার ইতিহাস এবং ভূগোলের অনেক কথা লুকাইয়া রাখিয়া অন্তত হাজার বৎসরের দারুণ বোঝা নীরবে বহিতেছে। এখন সে শোভার কিছুই নাই বটে, কিন্তু বল্লাল এবং লক্ষ্মণ সেনের দিনে এই স্থানের সৌন্দর্য্য কতক কতক অনুভব করা যায়।

বল্লাল সেন সম্বন্ধে এখানে অনেক রকম অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। ইতিহাসের চক্ষে তাহার কোন মূল্য নাই।

কাল-মৃগয়া।

(স্বরলিপি)

চতুর্থ দৃশ্য।

বন।

বন দেবতা।

রাগিণী মিয়ামল্লার – তাল কাওয়ালি।

সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশ দিশি,
স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল,
কি হ'বে কে জানে,
ঘোরা রজনী,
দিক-ললনা ভয়-বিভলা।
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী,
থরহর চরাচর ঝলকিয়ে;
ঘোর তিমির ছায় সব ব্যোম মেদিনী;
গুরু গুরু নীরদ গরজনে
স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে;
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ,
কড়-কড় ঘন ঘন বাজ।

প্রস্থান।

বনদেবীগণের প্রবেশ।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

সকলে। ঝিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে।
২ য়। গগনে ঘনঘটা শিহরে তরুলতা,
৩ য়। ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
সকলে। দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত,
১ ম। চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে! *

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

সকলে। আয় লো সজনি সবে মিলে;
ঝর ঝর বারি ধারা,
মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জ্জন,
এ বরষা দিনে,
হাতে হাতে ধরি ধরি,
গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে।
১ ম। ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগনন,
২ য়। মাথাব বরণ ফুলে ফুলে।
৩ য়। পিয়াব নবীন সলিল পিয়াসিত তরুলতা,
৪ য়। লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
১ ম। বনেরে সাজায়ে দিব গাঁথিব মুকুতা কণা,
পল্লব শ্যাম-দুকূলে।
২ য়। নাচিব সখি সবে নবঘন উৎসবে
বিকচ বকুল তরু মূলে।

---

* এই গানের স্বরলিপি শ্রাবণ মাসের বালকে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জন্য এবারে ইহার স্বরলিপি লিখিত হইল না।

রাগিণী মিয়ামল্লার—তাল কাওয়ালি।

০ ১ ২ ৩

ম—ম—গা—পা—॥ সা—গ—সা—সা—। নি—গ—গ্রে—রে—। ম— —ম—ম—।

স ঘ ন ঘ ন ছা ই ল গ গ ন ঘ না ই য়া

০ ১ ২ ৩

রে—গ—রে—ম—॥ ম—ম—ম——। পা—ধ—পা—ধ—। নি——পা—ম—।

স্তি মি ত দ শ দি শি স্ত স্তি ত কা ন ন

০ ১ ২ ৩

গা৹ম৹পা—নি—পা৹ম৹॥ গ৹রে৹গ—সা—সা—। নি—নি—সা—নি—। পা—পা—

স ব চ রা চ র আ কু ল কি হ বে কে জা

০ ১ ২ ৩

ম——। সা—গ—সা—গ—॥ সা—সা—সা—গ—। সা—গ—সা—ম—। ম—ম—ম—ম—।

নে ঘো র র জ নী দি ক- ল ল না ভ য় বি ভ লা

০ ১ ২ ৩

ম—ম—গা—পা—॥ সা—গ—সা—সা—। নি—নি—নি—সা—। সা—সা—সা—নি—॥

স ঘ ন ঘ ন ছা ই ল চ ম কে চ ম কে স হ

০ ১ ২ ৩

গ৹রে৹গ—ম—ম—॥ ম—ম—ম৹গা৹ম—। রে—রে—রে—ম—। ম—ম—ম—ম—।

সা দি ক উ জ লি চ কি তে চ কি তে মা তি

০ ১ ২ ৩

ম—পা—ম৹গা৹ম—॥ রে—রে—সা——। নি—নি—নি—সা—। সা—সা—সা—রে—।

ছু টি ল বি জ লি থ র হ র চ রা চ র

০ ১ ২ ৩

রে—ম—৹রে৹সা—॥ সা——সা—নি—। নি—সা—সা——। নি—ধ—ধ৹পা৹ধ—

ঝ ল কি য়ে ঘো র তি মি র ছায় স ব

০ ১ ২ ৩

নি— —পা—পা—॥ —ম—ম— —। গ—সা—গ—সা—। সা— —ম—ম—।

ব্যো ম মে দি নী গু রু গু রু নী র দ

০ ১ ২ ৩

ম—ম—ম—গ—॥ ম—ম— — —। ম৹গ৹ম—নি—ধ—। —ধ—নি——।

গ র জ নে স্ত ব্ধ আঁ ধা

০ ১ ২ ৩

—পা— —ম—॥ পা— —ম—ম—। ম—ম—ম—নি—। নি—নি—নি—নি—।

র ঘু মা ই ছে স হ সা উ ঠি ল জে গে

০ ১ ২ ৩

নি—সা—নি—সা—॥ রে—রে—সা—সা—। ম—ম—ম—ম—। ম৹ম৹ম৹ম৹পা—সা—।

প্র চ ণ্ড স মী র ণ ক ড় ক ড় ঘ ন ঘ ন বাজ্।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

০ ১ ২ ৩
রে—ম—রে—ম—॥ রে—রে—সা—সা—। রে——পা——। ম——মগ——॥
আর্ লো স জ নি স বে মি লে

০ ১ ২ ৩
গ—ম—রে—ম—॥ রে—রে—সা—সা—। রে——পা——। ———ম—।
আর্ লো স জ নি স বে মি লে

০ ১ ২ ৩
ম—পা—পা—পা—॥ পা—পা—ম—পা—। ধা—নি—ধা—নি০ধা০। পা—ধা০পা০
আর্ লো স জ নি স বে মি লে

০ ১ ২ ৩
ম—পা০ম০। রে—ম—রে—ম—॥ রে—রে—সা—সা—। রে——পা——। ম——
আর্ লো স জ নি স বে মি লে

০ ১ ২
মগ——। ম—পা—পা—পা—॥ ম—পা—পা—পা—। ম—পা—পা—পা—।
ঝ র ঝ র বা রি ধা রা মৃ হু মৃ হু

৩ ০ ১ ২
ম—পা—পা—পা—। পা——পা—পা—॥ সা——সা—সা—। সা——সা—সা—।
গু রু গু রু গ র্জ্জ ন এ ব র ষা দি নে

০ ১ ২
রে—নি—সা—ধা—। নি—ধা—নি—ধা—॥ পা—ধা—পা—ম—। ম—পা—ম—গা—।
হা তে হা তে ধ রি ধ রি গা ব মো রা ল তি কা দো

৩ ০ ১ ২
ম্রে—ম—রে—সা—॥ রে—ম—রে—ম—॥ রে—রে—সা—সা—। রে——পা——।
লায় দু লে আয় লো স জ নি স বে মি লে

৩ ০ ১ ২
ম——মগ——। ম—পা—পা—পা—॥ পা—পা—ম—পা—। ধা——সা—সা—॥
ফু টা ব য ত নে কে ত কী ক দ

৩ ০ ১ ২
নী—সা—ধা—ধা—। পা—পা—ম—ম—॥ গা—ম—রে—রে—। সা—সা—রে——॥
ম্ব অ গ ন ন মা থা ব ব র ণ ফু লে ফু

৩ ০ ১ ২
পা——ম——। ম্গ——গ—গ—॥ গ—ম—রে—রে—। সা—সা—রে——।
লে মা থা ব ব র ণ ফু লে ফু

৩ ০ ১ ২
পা——ম——। নী—নী—নী—নী—॥ সা——সা—নী—। সা———সা—॥
লে পি য়া ব ন বী ন স লি ল

৩ ০ ১ ২
রে—রে—রে—রে—। সা—সা—সা—নী—॥ নী—নী—নী—নী—। সা—নী—
পি য়া সি ত ত রু ল তা ল তি কা বী থি ব

৩ ০ ১
সা—রে—। নি—সা—নি—ধা—। পা—ধা—পা—ম—॥ ম—রে—সা—সা—।
গা ছে তু লে আয় লো স জ নি স বে

২ ৩ ০ ১
রে——পা——। ম——মগ——। ম—পা—পা—পা—॥ পা—পা—ম—পা—।
মি লে ব নে রে সা জা য়ে দি ব

২ ৩ ০ ১
ধা—সা—সা—সা—। ধা—ধা—পা—পা—। ম——গা—ম—॥ রে——সা—সা—।
গাঁ থি ব মু কু তা ক ণা প ল্ল ব শ্যা ম দু

২ ৩ ০ ১ ২
রে——পা——। ম——ম্গ——। গ——গ—ম—॥ রে— সা—সা—। রে——পা——।
কু লে প ল্ল ব শ্যা ম দু কু লে

৩ ০ ১ ২
———ম—। নী——নী—নী—॥ সা—সা—সা—সা—। রে—রে—রে—রে—।
না চি ব স খি স বে ন ব ঘ ন

৩ ০ ১ ২
সা——সা—নী—। নী—নী—নী—নী—॥ সা—নী—সা—রে—। নি—সা—মি—ধা—।
উৎ স বে বি ক চ ব কু ল ত রু মূ লে।

৩
পা-ধা—পা——।

করাচির চিঠি।

অনেক দিন হইতে আপনাকে চিঠি লিখিব লিখিব করিয়া এপর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। চিঠি লিখি আর নাই লিখি, প্রবাসে যে পড়িয়া আছি একথা এক দণ্ডও ভুলিতে পারি না! মন কেবল আপনাদের—দেশের বন্ধুবান্ধবদের দুয়ারের কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, কল্পনা দেশের অভিমুখে ছাড়া অন্য দিকে বড় একটা যাইতে চায় না।

কোথায় সে সমুদ্রের স্নিগ্ধ, মুক্ত, সুখস্পর্শ বাতাস, কোথায় বা সে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ! হাজার সমুদ্রের বিশাল আশ্রয়ে থাকি না কেন, এ সময়ে নিস্তার নাই! পাহাড় হইতে দিবানিশি বাতাস আসিতেছে, দারুণ শীতকে কাঁধে করিয়া আমাদের ঘরে আনিয়া

দিতেছে। চারিদিকে ধূলারণ্য—দিনেও কুজ্ঝটিকার মত ধূলা অন্ধকার করিয়া থাকে, যে দিকে চাহিয়া দেখি আকাশ ধূসরবর্ণ, নাকে চোখে ধূলা প্রবেশ করে, দোর জানালা বন্ধ করিয়া থাকিলেও রক্ষা নাই। বাতাস এমনি কন্‌কনে একটু গায়ে লাগিলে বোধ হয় মজ্জার ভিতর ছুরী বিঁধিতেছে। দু দণ্ড স্থির হইয়া বসিবার যো নাই, কাজকর্ম্ম করা প্রায় অসম্ভব, সকাল বেলা খানিকক্ষণ লিখিতে বসিলে হাত দুইটা যেন অসাড় হইয়া যায়। গত বৎসর এই ভয়ানক শীতে এক দিন প্রাতে সাহস করিয়া সমুদ্রের ধারে শাঁক কুড়াইতে গিয়াছিলাম। হাতখানা খসিয়া গিয়াছিল আর কি! সেই পর্য্যন্ত সে অসমসাহস ত্যাগ করিয়াছি।

রেলে আসিতে সমস্ত সিন্ধুদেশ দেখিতে মরুভূমির মত। যে সব উর্ব্বরা ভূমিখণ্ড আছে, সে গুলা রেলের কাছে নয়। করাচি সহরে দুই বৎসর আগে গাছপালা বড় ছিল না, জলের কল হইয়া অনেকটা শ্রী ফিরিয়াছে। আমি যখন এখানে প্রথম আসি তখন আমাদের বাড়ীতে গোটাকতক আধশুক্‌না গাছ ছিল—ফুল, ফল, পাতা সব লবণাক্ত। বাড়ীতে কল হইয়া অবধি দেখিতে দেখিতে গাছপালায় বাগান ভরিয়া গিয়াছে। গোলাপ, মল্লিকা, চন্দ্রমল্লিকা, দোপাটি, কৃষ্ণকেলী, অনেক রকম ফুল হইয়াছে। একটি ছোট শিউলি ফুলের গাছ পাইয়া সেটিকে যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। এখন বাড়ী বাড়ী বাগান হইতেছে।

সহর হইতে প্রায় ক্রোশখানেক দূরে অনেক গুলা বাগান আছে। সেইটা বাগান অঞ্চল। সেখানে জলের কল নাই, বড় বড় কূপ আছে, তাহাতেই বাগানের কাজ চলে। সেখানে মাটিও বেশ উর্ব্বরা। রাস্তার দুধারে এমন এক ক্রোশ বাগানের শ্রেণী আছে। তাহার পরেই লিয়ারী নদী। এই নদীতে কোন সময় জল থাকে না, কিন্তু মাটি একটু খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়। কল হইবার পূর্ব্বে লোকে এই জল পান করিত। একটু বৃষ্টি হইলেই লিয়ারী অত্যন্ত বেগবতী নদী হইয়া উঠে। এক রাত্রের মধ্যেই আবার শুকাইয়া যায়। বৃষ্টির পরে অনেক সময় লিয়ারীতে দুর্ঘটনা ঘটে। গরু, বাছুর, মানুষ পালাইতে না পালাইতে পাহাড় হইতে প্রচণ্ড স্রোত নামিয়া আসে, সম্মুখে যা কিছু পায় ভাসাইয়া সমুদ্রে লইয়া যায়। লিয়ারী নদী পার হইয়া খানিক পরেই ছোট ছোট পর্ব্বত শ্রেণী, সারির পর সারি, বেঁকিয়া চুরিয়া দূরে মিশাইয়া গিয়াছে, আকাশ প্রান্তে কালো কালো, নীল নীল মেঘের মত দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, লোকালয় নাই, শস্যের শ্যামল ক্ষেত্র নাই। কেবল কঠিন কৃষ্ণবর্ণ ভূমি—কঙ্কর, পাথর চারিদিকে বিছান রহিয়াছে। পাহাড়গুলা উলঙ্গ, কর্কশ, বন্ধুর। কোথাও কেবল মনসাসিজের কাঁটার মত এক রকম কাঁটাগাছ আছে। নিকটে জনপ্রাণী নাই—কদাচ কখন উষ্ট্রশ্রেণী উপত্যকার ভিতর দিয়া, কাঠের বোঝা, ঘাসের বোঝা লইয়া, সহরের দিকে আসিতে দেখা যায়। পাহাড়ের উপর উঠিয়া যখন বাগান গুলির উপর দৃষ্টি

পড়ে তখন তাহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়। শ্যামল ঘন দূর্ব্বামণ্ডিত ফল-ফুল পরিপূর্ণ বিহঙ্গকূজিত উদ্যানগুলি চারিদিকের জনশূন্য, তৃণশূন্য প্রান্তরের সঙ্গে তুলনা করিলে নন্দন কাননের মত বোধ হয়। বাগানে বাগানে একখানি বাড়ী ও অনেক রকম ফল ফুলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আঙ্গুর, কাবুলি ডুমুর, ডালিম, আম, জাম, আতা, আরও অনেক রকম ফল হয়। নিচু, কাঁঠাল দেখি নাই।

বাগান অঞ্চলে যে শুধু স্বভাব সৌন্দর্য্য আছে তা নয়। বাগানে যাহারা কাজ করে তাহাদের মধ্যে অনেকেই মেক্রাণী। মেক্রাণ বেলুচিস্থানের পশ্চিমে এবং পারস্য দেশের দক্ষিণে স্থিত। পুরুষ, স্ত্রীলোক, সকলে মিলিয়া বাগানে কাজ করে। মেক্রাণী স্ত্রী-লোকেরা পরমা সুন্দরী। খুব কালো চুল, কিন্তু কোঁকড়ান নয়, কপাল পরিষ্কার, ছোট, ভ্রূ নিবিড়, নীল ও স্থূল, তাহার নীচে কালো কালো টানা টানা চোকের কটাক্ষ তীব্র। মুখের ছাঁদ ঈষৎ লম্বা, নাক সোজা, টানা, ওষ্ঠাধর একটু স্থূল, রাঙা, চিবুকে মাংস একটু বেশী। ইহাদের মধ্যে অনেক এমন সুন্দরী আছে যে রাজরাণী হইলেও তাহাদের বড় বেশী সৌভাগ্য বোধ হয় না। বেশ বড় সামান্য। একটা পায়জামা, একটা হাঁটু পর্য্যন্ত কিম্বা পা পর্য্যন্ত জামা, আর মাথায় একটা মোটা কাপড়ের চাদর। ইহারা রংকরা কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় পরে না। বাগানের দিকে আগে আগে বেড়াইতে গিয়া বড় আশ্চর্য্য বোধ হইত। কোন দিন বিকালে দুই চারিজন বন্ধু মিলিয়া বেড়াইতে গিয়াছি, ডালপালা ফুল পাতার আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, আমরা ঘাসের ভিতর দিয়া, গাছের ডাল সরাইয়া অন্যমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় হঠাৎ আ-মাদের সমুখে, ঘনপাতার নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া, যেন মাটি ফুঁড়িয়া, একটি যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইল। যেন সাক্ষাৎ বনদেবী। চকিত, চঞ্চল চক্ষু, একটু সম্ভ্রম, একটু লজ্জার ভাব, একটু বিস্মিত, ঈষন্মুক্ত ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়া শুভ্র, সমান দশনপংক্তি দেখা যাইতেছে, হাতে বাগানের একটা অস্ত্র। একবার আমাদের দেখিয়াই সেখান হইতে দ্রুত পদে চলিয়া গেল। কখন বা সূর্য্য ডুবিয়াছে, আমরা বাগানের বাহিরে যাইতেছি, এমন সময় দেখি সেই সোনালি, অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে লতাপাতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটি বালিকা আমাদিগকে চাহিয়া দেখিতেছে। ছোট বালিকা হইলে পালায় না, চুপ করিয়া কৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। পুরুষেরা দেখিতে নিতান্ত সুপুরুষ নয়, কিন্তু মুখের শ্রী বড় মন্দ নয়। শুনিয়াছি তাহারা অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ, কিন্তু মেক্রাণী স্ত্রী-লোকদের বিষয় মন্দ কিছু শুনি নাই। কাজ কর্ম্মে তাহারা খুব পটু।

কিছু দিন হইল আমার গৃহিণী হয়দ্রাবাদে শ্রীযুক্ত ন——রায়ের বাড়ীতে গিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা আছে। গৃহিনী এখানে আসিয়া সিন্ধী কথা বেশ শিখিয়াছেন, সুতরাং এ দেশীয় স্ত্রীলোকদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কোন অসুবিধা হয় না। যে বাড়ীতে তিনি গিয়াছিলেন সেখান হইতে আর এক

বাড়ীতে এক দিন দেখা করিতে যান। তাঁহাকে দেখিতে পাড়াসুদ্ধ স্ত্রীলোক ভাঙ্গিয়াছিল, শেষ বাড়ীর লোকদের কৃপায় সে যাত্রা তাহাদের হাত এড়াইয়া আসেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে অবাক্। "হত্তন্ বুট্টি, পেরণ্ বুট্টি, নক্ বুট্টি, কন্ বুট্টি"—হাত, পা, নাক, কান, সব শুধু—ওমা কি হবে! হাতে যে দু একখানা সামান্য গহনা ছিল, সে গুলা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। এ আজ্‌গুবি জানোয়ার কোথা হইতে আসিয়াছে! শেষ সকলে মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, এ মণ্ডম্ (madam)। দিব্য সাড়ী পরা, মাথায় কাপড় দেওয়া, বাঙ্গালীর মেয়ে বিবি বনিয়া গেলেন। আশ্চর্য্য এই যে হয়দ্রাবাদে বিবি অনেক আছেন, সেখানকার সিন্ধী স্ত্রীলোকেরা পথেও চলে কিন্তু কখন মণ্ডম্ দেখে নাই। তাহার কারণ যে পথে তাহারা চলে সে পথে মণ্ডমদিগের শুভাগমন প্রায় কখনই হয় না।

বাঙ্গালীর মেয়েরা গহনা ভাল বাসে বটে কিন্তু আমাদের গহনায় আর এ দেশের গহনায় তফাৎ অনেক। আমি বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে এদেশের কয়েক জন স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, নহিলে তাঁহাদের দেখিতে পাওয়া ভার। গহনার মধ্যে সব প্রথম বাঁহি—সধবার লক্ষণ, যেমন আমাদের দেশে লোহা। আরও একটা সধবার লক্ষণ নথ, তাও কখন খুলিতে নাই। কিন্তু বাঁহি ভয়ঙ্কর আভরণ। বাঁহি হাতি দাঁতের চুড়ী, আগাগোড়া হাত সেই চুড়ীতে মোড়া। হাতের পঁইচা থেকে মূল পর্য্যন্ত একটুও দেখিবার যো নাই, এক তিল স্থান নাই। পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা এই বিষম গহনা পরিতে আরম্ভ করে, যতদিন সধবা থাকে তত দিন খোলে না। পাঁচ ছয় বৎসর অন্তর এক জোড়া বদলাইয়া আর এক জোড়া পরে। কত স্ত্রীলোকে কত যন্ত্রণা ভোগ করে, কতবার হাতে ঘা হয়, গ্রীষ্মকালে হাত ফুলিয়া ওঠে, টাটায়, পাকে, কিন্তু কেহ খোলে না, স্বপ্নেও খুলিবার কথা মনে করে না। যদি কাহারও হাত খুলিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুঝা যায় এই যন্ত্রণার ফল কেমন। কোথায় বা সে ভুজ মৃণাল, কোথায় বা সে সুকোমল কর সৌষ্ঠব। এখানকার স্ত্রীলোকদিগের গায়ের রং অধিকাংশই গৌরবর্ণ, কিন্তু এক জনেরও হাতের রং সুন্দর থাকে না। আগাগোড়া যেন তপ্তলোহার পোড়া দাগ, মাঝে মাঝে ঘাঁটা, চর্ম্ম কঠিন, কর্কশ। এখানে এখনো কোন নভেল লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু নভেলের আর সমস্ত উপকরণ আছে কেবল নায়িকার বাহুযুগল লতিকার মতও নয়, পল্লবের মতও নয়, মৃণালের মতও নয়। তবে দ্বিরদ-রদ বলিলে চলে। আর সেই গজদন্তময় বাহুর সাদর বন্ধন—কত ভীম তাহাতে চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

বাকি গহনাও ঐ রকম। পায়ের মল দুগাছি ওজনে দু সেরের কম কখনও হয় না। আমি দু গাছি চলিত মল দেখিয়াছিলাম, দেখিয়া এবং হাতে করিয়া আমার গায়ের রক্ত প্রায় জল হইয়া গিয়াছিল। সে মল দুগাছি ওজনে ২৫০ ভরি। এমন মল

পরিয়া গজেন্দ্রগমন বই অন্য কোন রকম চলন সম্ভবই নয়। একটী আট নয় বছরের মেয়েকে কাছে ডাকিয়া তাহার কাণের বিঁধ গনিয়াছিলাম। একটী কাণে দশটী বিঁধ! শুনিলাম কোন কোন সুন্দরীর ছিদ্র সংখ্যা আরও বেশী হয়। আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহাই বলিলাম। হয়দ্রাবাদের মেয়েরা যে নথ পরে সে গুলা বড় ভারি নয়, কিন্তু এখানে আমি যে সব নথ ও আর আর রকম নাসিকাভূষণ দেখিয়াছি তা কখন ভুলিবার নয়। যাহারা বড় বড় নাকছেবি পরে তাহাদের মুখ কিছুই দেখা যায় না। নাক, ঠোঁট, মুখ ত একেবারে ঢাকা পড়ে। আবার নাক না কাটিয়া যায় এই জন্য সে গুলাকে সুমুখের এক গোছা চুল দিয়া বাঁধিয়া রাখে। তাহাতে একটী চোকও আড়াল পড়ে।

মানুষের সব কিছু যেখানে শেষ হয় সেই বিষয় একটা গল্প বলিয়া এবার চিঠি শেষ করিব। মৃত্যুকালে এদেশের প্রথা বড় অদ্ভুত। আবার এখানে যে রকম হয়দ্রাবাদে ঠিক সে রকম নয়। কিছুদিন হইল এখানকার এক জন প্রধান লোকের মৃত্যু হয়। লোকটা সরকারে বেশ পরিচিত—রাও বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত। মৃত্যুর খবর শুনিয়া আমরা সব দেখিতে গেলাম। এমন সময় যাওয়া পদ্ধতি আছে। গিয়া দেখি শোকের অন্য কোন চিহ্ন নাই কেবল রাওবাহাদুরের একমাত্র পুত্র গোঁপ দাড়ি মাথা কামাইয়া কাঁদিতেছে। খানিকক্ষণ আমি তাহাকে চিনিতেই পারিলাম না। এই ছাড়া আর কোন শোকের চিহ্ন নাই। লোক জন বসিবার যেখানে জায়গা—সেটা পথের উপর—তারির কাছে গোটাপচিশ লোক করতাল হাতে খচ মচ করিয়া কাণে তালা ধরাইতেছে। আমি আবার একটু অসুস্থ ছিলাম। সেই বিষম, বিকট শব্দে অস্থির বোধ হইতে লাগিল। লোকের কথা শুনা যায় না, চেঁচাইয়া কাহাকেও কিছু না বলিলে কিছু শোনা যায় না। সেই পঁচিশ যোড়া করতাল সব শব্দ ডুবাইতেছে। বাজাইতে বাজাইতে লোকগুলা উঠিয়া দাঁড়াইল, নাচিতে লাগিল। ব্রাহ্মণদিগকে, আত্মীয় পরিজনদিগকে, কোরা কাপড়ের টুকুরা বিলান হইতেছে, তাহারা সকলে সেই বস্ত্রখণ্ড মাথায় বাঁধিতেছে। এমন সময় আবির আসিল, চারিদিকে আবির উড়িল, পাগড়ী মুখ, প্রাঙ্গণ, সব লালেলাল হইয়া গেল। আমরা একটু দূরে পলাইয়া বাঁচিলাম। এতক্ষণ শব ঘরের ভিতর ছিল। অবশেষে শবকে ঘর হইতে বাহির করা হইল। দরজা গলাইবার সময় দেখিলাম দুয়ারের সম্মুখে দুইজনে মিলিয়া একটা মস্ত ফুটা করা মাদুর ধরিল, শবকে তাহার ভিতর হইতে গলাইয়া আনিল। শব লইয়া যাইবার উপায় ধনী দরিদ্রের পক্ষে সমান। সকলেই একটা সিঁড়িতে করিয়া মৃতদেহ লইয়া যায়। তবে ধনীদের গৃহে চন্দন কাষ্ঠের সিঁড়ী তৈয়ার করে। সিঁড়ীতে কতকগুলা খড় বিছাইয়া তাহার উপর মৃত দেহ স্থাপন করে, তার পর একটা কাপড় মুড়িয়া সিঁড়ীর সঙ্গে দড়ী দিয়া বাঁধে। সিঁড়ীটা কেন ব্যবহার করে জানি না, হয়ত স্বর্গে উঠিবার সুবিধা হইবে বলিয়া। যখন শব বাহির হইল তখন আমরা দেখিলাম যে একখণ্ড বহুমূল্য কিংখাবে মৃতদেহ আবরিত

বিজ্ঞাপন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

৺ কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত,

টীকা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহিত।

বর্ত্তমান সময় ধর্ম্মান্দোলনের যুগ। সর্ব্বসাধারণের মন আজ কাল ধর্ম্মানুসন্ধানে রত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া আমি প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের জীবনলীলা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম সম্বলিত এই অপূর্ব্ব ভক্তি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছি। ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠে যে অতুল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুস্তকের সুবিধা না থাকায় অনেকে আপন আপন ভক্তি পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছেন না। এই অপূর্ব্ব ভক্তিশাস্ত্র এপর্য্যন্ত বটতলার ও শ্রীরামপুর প্রভৃতির ছাপাখানা ভিন্ন অন্য কোন স্থান হইতে প্রকাশিত হয় নাই। যে সকল মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অশুদ্ধি ও ভ্রমে পরিপূর্ণ। বিশেষত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতগ্রন্থ বহুল সংস্কৃত শ্লোকে পূর্ণ এবং ইহার কবিতা সকলে ষড়দর্শন প্রভৃতি গভীর আধ্যাত্মিক মত সকল সন্নিবেশিত হওয়ায় তাহা এত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে যে টীকা, ব্যাখ্যা ও অনুবাদের সাহায্য ভিন্ন তাহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হওয়া কঠিন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি বহু পরিশ্রম সহকারে প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি ও কয়েক খানি ছাপার পুস্তকের পাঠ ঐক্য করত সংস্কৃত অংশে একটী সরল টীকা ও বঙ্গানুবাদ এবং দুরূহ বাঙ্গলা কবিতার সহজ ব্যাখ্যা সম্বলিত এই গ্রন্থ সাধরণে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহাতে গ্রন্থকারের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থের স্থূল মর্ম্ম একটী দীর্ঘ ভূমিকাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন ও চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত বিবরণ

আদিলীলা, সন্ন্যাস হইতে দেশ পর্য্যটন ও পুরুষোত্তমে স্থিতি, মধ্য লীলা, ও শেষজীবনের অষ্টাদশবর্ষের ঘটনাবলী শেষলীলা নামে অভিহিত হইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থ একেবারে মুদ্রিত করিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়ে ও ব্যয় বাহুল্যও অতিরিক্ত হয়। সেজন্য তিনলীলা তিনখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। সম্প্রতি আদিলীলা মুদ্রিত হইতেছে। ইহা ডিমাই আটপেজি প্রায় ২০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ হইবে। তিন খণ্ডের মূল্য পাঁচটাকা অবধারিত হইল; কিন্তু আগামী চৈত্রমাসের মধ্যে যাঁহারা মূল্য দিবেন তাঁহাদের তিন টাকায় সমগ্র গ্রন্থ দেওয়া হইবে। ইচ্ছা করিলে প্রথমখণ্ড প্রকাশের পূর্ব্বে ১৷৷৹ ও পরে আর ১৷৷৹ দিলেও চলিবে। মপস্বলে স্বতন্ত্র ডাক মাসুল লাগিবেনা। প্রথম খণ্ড আগামী বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইবে।

গ্রাহকগণ আপন আপন নাম ধাম সহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় নব্যভারতের সম্পাদকের নিকট মূল্যের টাকা প্রেরণ করিবেন।

২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
মাঘ ১২৯২

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

উকীল, বিচারক, স্মৃতিব্যবসায়ী পণ্ডিত, টোলের ছা[illegible]
ও ধর্ম্মপিপাসু পাঠকদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়—

আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র।

(বিংশতি স্মৃতি।)

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য শেষ হইল। অনেকগুলি বিজ্ঞ বন্ধুর অনুরোধে আমরা এক্ষণ ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি সুলভ মূল্যে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমাদের দেশে এক্ষণে ভয়ানক সমাজ বিপ্লব উপস্থিত, এই সময় ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি আলোচনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। মনু ইতিপূর্ব্বে ২। ৩ বার মুদ্রিত হইয়াছিল কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য, আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া বিবিধ স্থান হইতে এই সকল অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি, এবং তাহা সাধারণের উপকারার্থে অতি সুলভ মূল্যে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। পূর্ব্ব প্রকাশিত মনু হইতে আমাদের মনুসংহিতায় আমরা কিছু নূতনত্ব দেখাইতে পারিব বলিয়া আশা করিতে পারি।

গ্রন্থের নাম		গ্রন্থসম্পূর্ণ হইলে যে মূল্য হইবেক।	অগ্রিম মূল্য।	ডাক মাসুল।
মনুসংহিতা, কুল্লূকভট্ট কৃত টীকা, বঙ্গানুবাদ ও সুদীর্ঘ উপক্রমণিকা সহিত ...	...	৫৲	২॥৹	।৶৹
অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম শাতাতপ ও বশিষ্ঠসংহিতা বঙ্গানুবাদসহ	...	১০	৫৲	৸৹
		১৫৲	৭॥৹	১৶৹

যদি কেহ মনু না লইয়া অপর ১৯ খানা সংহিতা লইতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাকে তাহা দেওয়া যাইবে, যাঁহারা আমাদের কার্য্যালয় হইতে পুস্তক লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ডাকমাসুল দিতে হইবে না। গ্রাহকদিগকে ডাকমাসুল সহ অগ্রিম মূল্য ৩০ এ ফাল্গুনের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। মনুসংহিতার সহিত যেরূপ গ্রাহকগণ মূল দায়ভাগ প্রাপ্ত হইবেন, সেইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার সহিত মিতাক্ষরা নামক ব্যবস্থা শাস্ত্র ও আমরা তাঁহাদিগকে উপহার দিতে যত্ন করিব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কার্য্যালয়,
৪৭নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। } শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

রহিয়াছে। পথে লোকের বড় ভিড়। সহরসুদ্ধ লোক ভিড়িয়াছে। সমস্ত পথে আবির ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। আমি কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিলাম, শ্মশান পর্য্যন্ত যাইতে পারি নাই।

শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমার নিমন্ত্রণ হয়। সেবার বড় জব্দ হইয়াছিলাম। ফলারের নাম শুনিলেই বাঙ্গালীর বুক দশ হাত হয়, তাতে আবার বড়মানুষের শ্রাদ্ধ। গিয়া দেখি জগন্নাথের প্রসাদের মত আট্‌কে অন্ন, লুচি তরকারিও সেইরূপ। বাড়ী আসিয়া আবার ভাত খাই। পরে শুনিলাম শ্রাদ্ধের সময় ভাল খাবার দাবার প্রস্তুত করিলে শোক প্রকাশ হয় না, এই জন্য জঘন্য খাবারের উদ্যোগ করে। ভাল দেশাচার বটে। মৃত্যুর দিবস ত নৃত্যগীত, তার পর ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া নাকাল করা।

রাজর্ষি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গুজুরপাড়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে ক্ষুদ্র গ্রাম। একজন ক্ষুদ্র জমিদার আছেন—নাম পীতাম্বর রায়—বাসন্দা অধিক নাই। পীতাম্বর আপনার পুরাতন চণ্ডিমণ্ডপে বসিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রজারাও তাঁহাকে রাজা বলিয়া থাকে। তাঁহার রাজ-মহিমা এই আম্রপিয়ালবনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামটুকুর মধ্যেই বিরাজমান। তাঁহার যশ এই গ্রামের নিকুঞ্জগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়া এই গ্রামের সীমানার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। জগতের বড় বড় রাজাধিরাজের প্রখর প্রতাপ এই ছায়াময় নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। কেবল, তীর্থ স্নানের উদ্দেশে নদীতীরে ত্রিপুরার রাজাদের এক বৃহৎ প্রাসাদ আছে, কিন্তু অনেক কাল হইতে রাজারা কেহ স্নানে আসেন নাই, সুতরাং ত্রিপুরার রাজার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি প্রচলিত আছে মাত্র।

একদিন ভাদ্রমাসের দিনে গ্রামে সংবাদ আসিল ত্রিপুরার এক রাজকুমার নদীতীরের পুরাতন প্রাসাদে বাস করিতে আসিতেছেন। কিছু দিন পরে বিস্তর পাগড়িবাঁধা লোক আসিয়া প্রাসাদে ভারি ধুম লাগাইয়া দিল। তাহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে হাতি ঘোড়া লোক লস্কর লইয়া স্বয়ং নক্ষত্র রায় গুজুরপাড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমারোহ দেখিয়া গ্রামবাসীদের মুখে যেন রা সরিল না। পীতাম্বরকে এত দিন ভারি রাজা বলিয়া মনে হইত কিন্তু আজ আর তাহা কাহারও মনে হইল না—নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিল "হাঁ রাজপুত্র এই রকমই হয় বটে!"

এইরূপে পীতাম্বর তাঁহার পাকা দালান ও চণ্ডিমণ্ডপসুদ্ধ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। নক্ষত্ররায়কে তিনি এমনি রাজা বলিয়া অনুভব করিলেন যে নিজের ক্ষুদ্র রাজমহিমা নক্ষত্ররায়ের চরণে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া তিনি পরম সুখী হইলেন। নক্ষত্ররায় কদাচিৎ হাতি চড়িয়া বাহির হইলে পীতাম্বর আপনার প্রজাদের ডাকিয়া বলিতেন "রাজা দেখেছিস্? ঐ দেখ্ রাজা দেখ্!" মাছ তরকারী আহার্য্য দ্রব্য উপহার লইয়া পীতাম্বর প্রতিদিন নক্ষত্র-রায়কে দেখিয়া আসিতেন—নক্ষত্ররায়ের তরুণ সুন্দর মুখ দেখিয়া পীতাম্বরের স্নেহ উচ্ছসিত হইয়া উঠিত। নক্ষত্ররায়ই গ্রামের রাজা হইয়া উঠিলেন। পীতাম্বর প্রজাদের মধ্যে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন।

প্রতিদিন তিন বেলা নহবৎ বাজিতে লাগিল, গ্রামের পথে হাতি ঘোড়া চলিতে লাগিল, রাজদ্বারে মুক্ত তরবারির বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, হাটবাজার বসিয়া গেল। পীতাম্বর এবং তাঁহার প্রজারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। নক্ষত্ররায় এই নির্ব্বাসনের রাজা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিলেন। এখানে রাজত্বের ভার কিছুমাত্র নাই অথচ রাজত্বের সুখ সম্পূর্ণ আছে। এখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বদেশে তাঁহার এত প্রবল প্রতাপ ছিল না। তাহা ছাড়া, এখানে রঘুপতির ছায়া নাই। মনের উল্লাসে নক্ষত্র-রায় বিলাসে মগ্ন হইলেন। ঢাকা নগরী হইতে নটনটী আসিল, নৃত্যগীতবাদ্যে নক্ষত্র-রায়ের তিলেক অরুচি নাই।

নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার রাজ অনুষ্ঠান সমস্তই অবলম্বন করিলেন। ভৃত্যদের মধ্যে কাহারও নাম রাখিলেন মন্ত্রী, কাহারও নাম রাখিলেন সেনাপতি, পীতাম্বর দেওয়ানজি নামে চলিত হইলেন। রীতিমত রাজদরবার বসিত। নক্ষত্ররায় পরম আড়ম্বরে বিচার করিতেন। নকুড় আসিয়া নালিশ করিল "মথুর আমায় 'কুত্তো' ক'য়েছে" তাহার বিধিমত বিচার বসিল। বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহের পর মথুর দোষী সাব্যস্ত হইলে নক্ষত্র রায় পরম গম্ভীর ভাবে বিচারাসন হইতে আদেশ করিলেন—নকুড় মথুরকে দুই কানমলা দেয়। এইরূপে সুখে সময় কাটিতে লাগিল। এক-এক দিন হাতে নিতান্ত কাজ না থাকিলে সৃষ্টিছাড়া একটা কোন নূতন আমোদ উদ্ভাবনের জন্য মন্ত্রীকে তলব পড়িত। মন্ত্রী রাজসভাসদদিগকে সমবেত করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন ব্যাকুলভাবে নূতন খেলা বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, গভীর চিন্তা এবং পরামর্শের অবধি থাকিত না। এক দিন সৈন্য সামন্ত লইয়া পীতাম্বরের চণ্ডিমণ্ডপ আক্রমণ করা হইয়াছিল—এবং তাহার পুকুর হইতে মাছ ও তাঁহার বাগান হইতে ডাব ও পালংশাক লুঠের দ্রব্যের স্বরূপ অত্যন্ত ধূম করিয়া বাদ্য বাজাইয়া প্রাসাদে আনা হইয়াছিল। এইরূপ খেলাতে নক্ষত্র রায়ের প্রতি পীতাম্বরের স্নেহ আরও গাঢ় হইত।

আজ প্রাসাদে বিড়াল শাবকের বিবাহ। নক্ষত্ররায়ের একটি শিশু বিড়ালী ছিল,

তাহার সহিত মণ্ডলদের বিড়ালের বিবাহ হইবে। চূড়ামণি ঘটক ঘটকালির স্বরূপ তিন শত টাকা ও একটা শাল পাইয়াছে। গায়ে-হলুদ প্রভৃতি সমস্ত উপক্রমণিকা হইয়া গিয়াছে। আজ শুভলগ্নে সন্ধ্যার সময়ে বিবাহ হইবে। এ কয়দিন রাজবাটিতে কাহারও তিলার্দ্ধ অবসর নাই।

সন্ধ্যার সময় পথঘাট আলোকিত হইল, নহবৎ বসিল। মণ্ডলদের বাড়ি হইতে চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া কিঙ্খাবের বেশ পরিয়া পাত্র অতি কাতর স্বরে মিউ মিউ করিতে করিতে যাত্রা করিয়াছে। মণ্ডলদের বাড়ির ছোট ছেলেটি মিৎ-বরের মত তাহার গলার দড়িটি ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। উলু-শঙ্খধ্বনির মধ্যে পাত্র সভাস্থ হইল। পুরোহিতের নাম কেনারাম—কিন্তু নক্ষত্ররায় তাহার নাম রাখিয়াছেন রঘুপতি। নক্ষত্র-রায় আসল রঘুপতিকে ভয় করিতেন এই জন্য নকল রঘুপতিকে লইয়া খেলা করিয়া সুখী হইতেন—এমন কি, কথায় কথায় তাহাকে উৎপীড়ন করিতেন—গরীব কেনারাম সমস্ত নীরবে সহ্য করিত। আজ দৈবদুর্ব্বিপাকে কেনারাম সভায় অনুপস্থিত—তাহার ছেলেটি জরবিকারে মরিতেছে। নক্ষত্র রায় অধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "রঘুপতি কোথায়?" ভৃত্য বলিল—"তাঁহার বাড়িতে ব্যামো।" নক্ষত্ররায় দ্বিগুণ হাঁকিয়া বলিলেন "বোলাও উস্‌কো।" লোক ছুটিল। ততক্ষণ রোরুদ্যমান বিড়ালের সমক্ষে নাচ গান চলিতে লাগিল। নক্ষত্ররায় বলিলেন "সাহানা গাও।" সাহানা গান আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল "রঘুপতি আসিয়াছেন।" নক্ষত্ররায় সরোষে বলিলেন "বোলাও!" তৎক্ষণাৎ পুরোহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিতকে দেখি-য়াই নক্ষত্ররায়ের ভ্রূকুটি কোথায় মিলাইয়া গেল, তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিল। সাহানা গান, সারঙ্গ ও মৃদঙ্গ সহসা বন্ধ হইল, কেবল বিড়ালের কাতর মিউ মিউ ধ্বনি নিস্তব্ধ ঘরে দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিল।

এ রঘুপতিই বটে। তাহার আর সন্দেহ নাই। দীর্ঘ, শীর্ণ, তেজস্বী, বহুদিনের ক্ষুধিত কুকুরের মত চক্ষু দুটো জ্বলিতেছে। ধূলায় পরিপূর্ণ দুই পা তিনি কিঙ্খাব মছ-লন্দের উপর স্থাপন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"নক্ষত্ররায়!" নক্ষত্র-রায় চুপ করিয়া রহিলেন। রঘুপতি বলিলেন—"তুমি রঘুপতিকে ডাকিয়াছ। আমি আসিয়াছি।" নক্ষত্ররায় অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন "ঠাকুর—ঠাকুর!" রঘুপতি কহিলেন "উঠিয়া এস!" নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। বিড়ালের বিয়ে, সহানা এবং সারং একেবারে বন্ধ হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সব কি হইতেছিল?"

নক্ষত্ররায় মাথা চুলকাইয়া কহিলেন "নাচ হইতেছিল।"

রঘুপতি ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া কহিলেন "ছী ছি!" নক্ষত্ররায় অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "কাল এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। তাহার উদ্যোগ কর।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "কোথায় যাইতে হইবে?"

রঘুপতি—"সে কথা পরে হইবে। আপাততঃ আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি—"বেশ আছি! তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ, তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা সকলে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। তুমি কি না আজ এই বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হইয়া বসিয়াছ আর বলিতেছ 'বেশ আছি'!"

রঘুপতি তীব্রবাক্যে ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে নক্ষত্ররায় ভাল নাই। নক্ষত্ররায়ও রঘুপতির মুখের তেজে কতকটা সেই রকমই বুঝিলেন। তিনি বলিলেন "বেশ আর কি এমনি আছি! কিন্তু আর কি করিব! উপায় কি আছে!"

রঘুপতি—"উপায় ঢের আছে—উপায়ের অভাব নাই। আমি তোমাকে উপায় দেখাইয়া দিব—তুমি আমার সঙ্গে চল।"

নক্ষত্ররায় "একবার দাওয়ান্‌জিকে জিজ্ঞাসা করি!"

রঘুপতি "না!"

নক্ষত্ররায়—"আমার এই সব জিনিষ পত্র—"

রঘুপতি "কিছু আবশ্যক নাই।"

নক্ষত্ররায়—"লোক জন সব—"

রঘুপতি—"দরকার নাই।"

নক্ষত্ররায়—"আমার হাতে এখন যথেষ্ট নগদ টাকা নাই।"

রঘুপতি—"আমার আছে। আর অধিক ওজর আপত্তি করিও না। আজ শয়ন করিতে যাও, কাল প্রাতঃকালেই যাত্রা করিতে হইবে।" বলিয়া রঘুপতি কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পরদিন ভোরে নক্ষত্ররায় উঠিয়াছেন। তখন বন্দীরা ললিত রাগিণীতে মধুর গান গাহিতেছে। নক্ষত্ররায় বহির্ভবনে আসিয়া জানলা হইতে বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। পূর্ব্বতীরে সূর্য্যোদয় হইতেছে, অরুণ রেখা দেখা দিয়াছে। উভয়তীরের ঘন তরুস্রোতের মধ্য দিয়া, ছোট ছোট নিদ্রিত গ্রামগুলির দ্বারের কাছ দিয়া ব্রহ্মপুত্র তাহার বিপুল জলরাশি লইয়া অবাধে বহিয়া যাইতেছে। প্রাসাদের জানলা হইতে নদীতীরের একটি ছোট কুটীর দেখা যাইতেছে। একটি মেয়ে প্রাঙ্গন ঝাঁট দিতেছে—একজন পুরুষ তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিয়া মাথায় চাদর বাঁধিয়া, একটা বড়

বাঁশের লাঠির অগ্রভাগে পুঁটুলি লইয়া নিশ্চিন্তমনে কোথায় বাহির হইল। শ্যামা ও দোয়েল শিশ্ দিতেছে, বেনেবউ বড় কাঁঠালগাছের ঘন পল্লবের মধ্যে বসিয়া গান গাহিতেছে। বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃদয় হইতে এক গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে রঘুপতি আসিয়া নক্ষত্ররায়কে স্পর্শ করিলেন। নক্ষত্ররায় চমকিয়া উঠিলেন। রঘুপতি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন "যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত।"

নক্ষত্ররায় যোড়হাতে অত্যন্ত কাতরস্বরে কহিলেন "ঠাকুর, আমাকে মাপ কর ঠাকুর—আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমি এখানে বেশ আছি।",

রঘুপতি একটি কথা না বলিয়া নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে তাঁহার অগ্নিদৃষ্টি স্থির রাখিলেন। নক্ষত্ররায় চোখ নামাইয়া কহিলেন "কোথায় যাইতে হইবে?"

রঘুপতি—"সে কথা এখন হইতে পারে না।"

নক্ষত্র—"দাদার বিরুদ্ধে আমি কোন চক্রান্ত করিতে পারিব না।"

রঘুপতি জলিয়া উঠিয়া কহিলেন "দাদা তোমার কি মহৎ উপকারটা করিয়াছেন শুনি!"

নক্ষত্র মুখ ফিরাইয়া, জানলার উপর আঁচড় কাটিয়া বলিলেন "আমি জানি, তিনি আমাকে ভাল বাসেন।"

রঘুপতি তীব্র শুষ্ক হাস্যের সহিত কহিলেন "হরি হরি, কি প্রেম! তাই বুঝি নির্ব্বিঘ্নে ধ্রুবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্যে মিছা ছুতা করিয়া দাদা তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়াইলেন—পাছে রাজ্যের গুরুভারে ননীর পুতলি স্নেহের ভাই কখনও ব্যথিত হইয়া পড়ে! সে রাজ্যে আর কি কখনও সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে? নির্ব্বোধ!"

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিলেন "আমি কি এই সামান্য কথাটা আর বুঝি না? আমি সমস্তই বুঝি—কিন্তু আমি কি করিব বল ঠাকুর, উপায় কি!"

রঘুপতি "সেই উপায়ের কথাইত হইতেছে। সেই জন্যইত আসিয়াছি। ইচ্ছা হয়ত আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, নয়ত এই বাঁশবনের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তোমার হিতাকাঙ্খী দাদার ধ্যান কর। আমি চলিলাম।"

বলিয়া রঘুপতি প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কহিলেন "আমিও যাইব ঠাকুর, কিন্তু দেওয়ানজি যদি যাইতে চান তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে কি আপত্তি আছে?

রঘুপতি কহিলেন "আমি ছাড়া আর কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

বাড়ি ছাড়িয়া নক্ষত্ররায়ের পা সরিতে চায় না। এই সমস্ত সুখের খেলা ছাড়িয়া, দেওয়ানজিকে ছাড়িয়া রঘুপতির সঙ্গে একলা কোথায় যাইতে হইবে! কিন্তু রঘুপতি

যেন তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাহা ছাড়া নক্ষত্ররায়ের মনে এক প্রকার ভয়মিশ্রিত কৌতূহলও জন্মিতে লাগিল। তাহারও একটা ভীষণ আকর্ষণ আছে।

নৌকা প্রস্তুত আছে। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নক্ষত্ররায় দেখিলেন কাঁধে গামছা ফেলিয়া পীতাম্বর স্নান করিতে আসিতেছেন। নক্ষত্রকে দেখিয়াই পীতাম্বর হাস্য-বিকশিত মুখে কহিলেন "জয়োস্তু মহারাজ, শুনিলাম না কি কাল কোথা হইতে এক অলক্ষণমন্ত বিটল ব্রাহ্মণ আসিয়া শুভ বিবাহের ব্যাঘাত করিয়াছে!"

নক্ষত্ররায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। রঘুপতি গম্ভীর ভাবে কহিলেন "আমিই সেই বিটল ব্রাহ্মণ।"

পীতাম্বর হাসিয়া উঠিলেন কহিলেন "তবে ত আপনার সাক্ষাতে আপনার বর্ণনা করাটা ভাল হয় নাই! জানিলে কোন্ পিতার পুত্র এমন্ কাজ করিত! কিছু মনে করিবেন না ঠাকুর, অসাক্ষাতে লোকে কি না বলে! আমাকে যাহারা সমুখে বলে রাজা, তাহারা আড়ালে বলে পীতু। মুখের সামনে কিছু না বলিলেই হইল, আমিত এই বুঝি। আসল কথা কি জানেন্ আপনার মুখটা কেমন ভারি অপ্রসন্ন দেখাইতেছে, লোকে এমন মুখের ভাব দেখিলে তাহার নামে নিন্দা রটায়!—মহারাজ এত প্রাতে যে নদীতীরে!"

নক্ষত্ররায় কিছু করুণ স্বরে কহিলেন "আমি যে চলিলাম দেওয়ানজি!"

পীতাম্বর—"চলিলেন? কোথায়? নপাড়ায়, মণ্ডলদের বাড়ি?"

নক্ষত্র "না দেওয়ানজি, মণ্ডলদের বাড়ি নয়। অনেক দূর।"

পীতা—"অনেক দূর? তবে কি পাইকঘাটায় শিকারে যাইতেছেন?"

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া কেবল বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িলেন। রঘুপতি কহিলেন "বেলা বহিয়া যায়, নৌকায় উঠা হোক।" পীতাম্বর অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধভাবে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন কহিলেন "তুমি কে হে ঠাকুর? আমাদের মহারাজকে হুকুম করিতে আসিয়াছ!"

নক্ষত্র ব্যস্ত হইয়া পীতাম্বরকে একপাশে টানিয়া লইয়া কহিলেন "উনি আমাদের গুরু ঠাকুর!"

পীতাম্বর বলিয়া উঠিলেন "হোক্‌না গুরু ঠাকুর! উনি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে থাকুন, চাল কলা বরাদ্দ করিয়া দিব, সমাদরে থাকিবেন—মহারাজকে উঁহার কিসের আবশ্যক?"

রঘুপতি—"বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে—আমি তবে চলিলাম।"

পীতাম্বর "যে আজ্ঞে, বিলম্বে ফল কি, মশায় চট্‌পট্ সরিয়া পড়ুন। মহারাজকে লইয়া আমি প্রাসাদে যাই।"

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া একবার পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "না দেওয়ানজি, আমি যাই।"

পীতাম্বর—"তবে আমিও যাই; লোক জন সঙ্গে লউন্। রাজার মত চলুন্। রাজা যাইবেন, সঙ্গে দেওয়ানজি যাইবে না?"

নক্ষত্ররায় কেবল রঘুপতির মুখের দিকে চাহিলেন। রঘুপতি কহিলেন "কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

পীতাম্বর উগ্র হইয়া উঠিয়া কহিলেন—"দেখ ঠাকুর তুমি—" নক্ষত্ররায় তাঁহাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন "দেওয়ানজি, আমি যাই, দেরি হইতেছে।"

পীতাম্বর ম্লান হইয়া নক্ষত্রের হাত ধরিয়া কহিলেন "দেখ বাবা, আমি তোমাকে রাজা বলি, কিন্তু আমি তোমাকে সন্তানের মত ভালবাসি—আমার সন্তান কেহ নাই। তোমার উপর আমার জোর থাটে না। তুমি চলিয়া যাইতেছ, আমি জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ এই আছে যেখানেই যাও, আমি মরিবার আগে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি স্বহস্তে আমার রাজত্ব সমস্ত তোমার হাতে দিয়া যাইব। আমার এই একটি সাধ আছে।"

নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দক্ষিণমুখে চলিয়া গেল। পীতাম্বর স্নান ভুলিয়া গামছা কাঁধে অন্যমনস্কে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। গুজুরপাড়া যেন শূন্য হইয়া গেল—তাহার আমোদ উৎসব সমস্ত অবসান। কেবল প্রতি দিন প্রকৃতির নিত্য উৎসব, প্রাতে পাখীর গান, পল্লবের মর্ম্মর ধ্বনি ও নদী তরঙ্গের করতালির বিরাম নাই।

হেঁয়ালি নাট্য।

প্রথম দৃশ্য।

(উকীল দুকড়ি দত্ত চেয়ারে আসীন; ভয়ে ভয়ে খাতা হস্তে কাঙালিচরণের প্রবেশ)

দুকড়ি। কি চাই?

কা। আজ্ঞে, মশায় হচ্চেন দেশহিতৈষী—

দু। তা'ত সকলেই জানে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?

কা। আপনি সাধারণের হিতের জন্য প্রাণপণ—

দু। ক'রে ওকালতি ব্যবসা চালাচ্চি, তাও কারও অবিদিত নেই—কিন্তু তোমার বক্তব্যটা কি?

কা। আজ্ঞে বক্তব্য বেশী নেই।

ছু। তবে শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেল না।

কা। একটু বিবেচনা করে দেখ্‌লে আপনাকে স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে "গানাৎ-পরতরংনহি"—

ছু। বাপু বিবেচনা এবং স্বীকার করবার পূর্ব্বে যে কথাটা বল্লে তার অর্থ জানা বিশেষ আবশ্যক। ওটা বাঙ্গলা করে বল।

কা। আজ্ঞে বাঙ্গলাটা ঠিক জানিনে। তবে মর্ম্মটা হচ্চে এই, গান জিনিষটা শুন্‌তে বড় ভাল লাগে।

ছু। সকলের ভাল লাগে না।

কা। গান যার ভাল না লাগে সে হচ্চে—

ছু। উকীল শ্রীযুক্ত ছুকড়ি দত্ত।

কা। আজ্ঞে অমন কথা বল্‌বেন না।

ছু। তবে কি মিথ্যে কথা বল্‌ব?

কা। আর্য্যাবর্ত্তে ভরতমুনি হচ্চেন গানের প্রথম—

ছু। ভরত মুনির নামে যদি কোন মকদ্দমা থাকে ত বল, নইলে বক্তৃতা বন্ধ কর।

কা। অনেক কথা বল্‌বার ছিল—

ছু। কিন্তু অনেক কথা শোন্‌বার সময় নেই।

কা। তবে সংক্ষেপে বলি। এই মহানগরীতে "গানোন্নতি বিধায়িনী" নাম্নী এক সভা স্থাপন করা গেছে, তাতে মশায়কে—

ছু। বক্তৃতা দিতে হবে?

কা। আজ্ঞে না।

ছু। সভাপতি হতে হবে?

কা। আজ্ঞে না।

ছু। তবে কি কর্‌তে হবে বল? গান গাওয়া এবং গান শোনা, এ দুটোর কোনটা আমার দ্বারা কখন হয় নি এবং হবেও না—তা আমি আগে থাক্‌তে বলে রাখ্‌চি।

কা। মশায়কে ও দুটোর কোনটাই করতে হবে না। (খাতা অগ্রসর করিয়া) কেবল কিঞ্চিৎ চাঁদা—

ছু। (ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া) চাঁদা! আ সর্ব্বনাশ! তুমিত সহজ লোক নওহে—ভালমানুষটির মত মুখ কাচুমাচু করে এসেছ—আমি বলি বুঝি কি মকদ্দমার ফেসাদে পড়েছ! তোমার চাঁদার খাতা নিয়ে বেরোও এখনি—নইলে ট্রেসপাসের দাবী দিয়ে পুলীস্ কেশ্ আন্‌ব।

কা। চাইলুম চাঁদা পেলুম অর্দ্ধচন্দ্র! (স্বগত) কিন্তু তোমাকে জব্দ করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ছুকড়ি বাবু কতকগুলি সংবাদ পত্র হস্তে)

ছু। এ ত বড় মজাই হল! কাঙালী চরণ ব'লে কে একজন লোক ইংরিজি বাংলা সমস্ত খবরের কাগজে লিখে পাঠিয়েছে যে আমি তাদের "গানোন্নতি বিধায়িনী" সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেচি। দান চুলোয় যাক, গলাধাক্কা দিতে বাকি রেখেচি। মাঝের থেকে আমার খুব নাম রটে গেল—এ'তে আমার ব্যবসার পক্ষে ভারি সুবিধে। তাদেরও সুবিধে, লোকে মনে করবে, যখন পাঁচ হাজার টাকা দান পেয়েচে তখন অবিশ্যি মস্ত সভা। পাঁচ জায়গা থেকে ভারি ভারি চাঁদা আদায় হবে। যা হোক্ আমার অদৃষ্ট ভাল।

কেরাণী বাবুর প্রবেশ।

কে। মশায় তবে গানোন্নতি সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেচেন ?

ছু। (মাথা চুল্‌কাইয়া হাসিয়া) আ—ও একটা কথার কথা। শোন কেন ? কে বল্লে দিয়েছি ? মনে কর যদিই দিয়ে থাকি, তা হয়েছে কি! এত গোলের আবশ্যক কি!

কে। আহা কি বিনয়! পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়ে গোপন করবার চেষ্টা, সাধারণ লোকের কাজ নয়।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃ। নীচের ঘরে বিস্তর লোক জমা হয়েচে।

ছু। (স্বগত) দেখেচ! এক দিনেই আমার পসার বেড়ে গেছে। (সানন্দে) একে একে তাদের উপরে নিয়ে আয়—আর পান তামাক দিয়ে যা।

১ম ব্যক্তির প্রবেশ।

ছু। (চৌকি সরাইয়া) আসুন্—বসুন্। মশায় তামাক ইচ্ছে করুন। ওরে—পান দিয়ে যা।—

১ম। (স্বগত) আহা কি অমায়িক প্রকৃতি! এঁর কাছে কামনা সিদ্ধি হবে না ত কার কাছে হবে!

ছু। মশায়ের কি অভিপ্রায়ে আগমন ?

১ম। আপনার বদান্যতা দেশ-বিখ্যাত।

ছু। ওসব গুজবের কথা শোনেন কেন ?

১ম। কি বিনয়! কেবল মশায়ের নামই শ্রুত ছিলুম, আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হল।

হু। (স্বগত) এখন আসল কথাটা যে পাড়লে হয়! বিস্তর লোক বসে আছে। (প্রকাশ্যে) তা' মশায়ের কি আবশ্যক?

১ম। দেশের উন্নতি উদ্দেশে হৃদয়ের—

হু। আজ্ঞে সে সব কথা বলাই বাহুল্য—

১ম। তা ঠিক—মশায়ের মত মহানুভব ব্যক্তি, যাঁরা ভারত ভূমির—

হু। সমস্ত মান্‌চি মশায়—অতএব ও অংশটুকুও ছেড়ে দিন্। তার পরে—

১ম। বিনয়ী লোকের স্বভাবই এই যে নিজের গুণানুবাদ—

হু। রক্ষে করুন মশায়। আসল কথাটা বলুন।—

১ম। আসল কথা কি জানেন—দিনে দিনে আমাদের দেশ অধোগতি প্রাপ্ত হচ্চে—

হু। সে কেবল মাত্র কথা সংক্ষেপ করতে না জানার দরুন।

১ম। আমাদের স্বর্ণ শস্যশালিনী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দারিদ্র্যের অন্ধকূপে—

হু। (সকাতরে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া) বলে যান্।

১ম। দারিদ্র্যের অন্ধকূপে দিনে দিনে নিমজ্জমানা—

হু। (কাতর স্বরে) মশায়, বুঝ্‌তে পারচিনে।

১ম। তবে আপনাকে প্রকৃত ব্যাপারটা বলি—

হু। (সানন্দে সাগ্রহে) সেই ভাল।

১ম। ইংরেজরা লুঠ করচে—

হু। এ ত বেশ কথা! প্রমাণ সংগ্রহ করুন, ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নালিষ রুজু করি।

১ম। ম্যাজিষ্ট্রেটও লুঠ্‌ছে।

হু। তবে ডিষ্ট্রিক্ট্ জজের আদালত—

১ম। ডিষ্ট্রিক্ট্ জজত ডাকাত।

হু। (অবাক্ ভাবে) আপনার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পারচিনে।

১ম। আমি বল্‌চি দেশের টাকা বিদেশে চালান যাচ্চে।

হু। দুঃখের বিষয়।

১ম। তাই একটা সভা—

হু। (সচকিত) সভা!

১ম। এই দেখুন্ না খাতা।

হু। (বিস্ফারিত নেত্রে) খাতা!

১ম। কিঞ্চিৎ চাঁদা—

হু। (চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া) চাঁদা! বেরোও—বেরোও—বেরোও—

(তাড়াতাড়িতে চৌকি উল্টাইয়ন, কালি ফেলন, প্রথম ব্যক্তির বেগে প্রস্থানোদ্যম, পতন, উত্থান, গোলমাল)

দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ।

হু। কি চাই!

দ্বি। মহাশয়ের দেশবিখ্যাত বদান্যতা—

হু। ওসব হয়ে গেছে—হয়ে গেছে—নতুন কিছু থাকে ত বল।

দ্বি। আপনার দেশ-হিতৈষিতা—

হু। আ মোলো—এও যে সেই কথাটাই বলে!

দ্বি। স্বদেশের সদনুষ্ঠানে আপনার সদনুরাগ—

হু। এ ত বিষম দায় দেখি। আসল কথাটা খুলে বলুন!

দ্বি। একটা সভা—

হু। আবার সভা!

দ্বি। এই দেখুন না খাতা!

হু। খাতা! কিসের খাতা!

দ্বি। চাঁদা আদায়—

হু। চাঁদা (হাত ধরিয়া টানিয়া) ওঠ, ওঠ, বেরোও বেরোও—প্রাণের মায়া থাকে ত—

(দ্বিরুক্তি না করিয়া চাঁদা ওয়ালার প্রস্থান।)

তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ।

হু। দেখ বাপু, আমার দেশহিতৈষিতা বদান্যতা বিনয় এ সমস্ত শেষ হয়ে গেছে—তারপর থেকে আরম্ভ কর।

তৃ। আপনার সার্ব্বভৌমিকতা, সার্ব্বজনীনতা—উদারতা—

হু। তবু ভাল। এ কিছু নতুন ঠেক্‌চে বটে। কিন্তু মশায় ও গুলোও থাক—ভাষায় কথা আরম্ভ করুন!

তৃ। আমাদের একটা লাইব্রেরি—

হু। লাইব্রেরি? সভা নয় ত?

তৃ। আজ্ঞে সভা নয়।

হু। আ বাঁচা গেল। লাইব্রেরি। অতি উত্তম। তার পরে বলে যাও।

তৃ। এই দেখুন্ না প্রস্পেক্টস্—

হু। খাতা নেইত?

তৃ। আজ্ঞে না,—খাতা নয় ছাপান কাগজ।

হু। আ।—তার পরে।

তৃ। কিঞ্চিৎ চাঁদা।

হু। (লাফাইয়া) চাঁদা! ওরে, আমার বাড়ি আজ ডাকাত পড়েচেরে! পুলিসম্যান্ পুলিস্‌ম্যান্।

(তৃতীয় ব্যক্তির ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন।)

হরশঙ্কর বাবুর প্রবেশ।

হু। আরে এস এস, হরশঙ্কর এস। সেই কালেজে এক সঙ্গে পড়া—তার পরে ত আর দেখা হয় নি—তোমাকে দেখে কি যে আনন্দ হল সে আর কি বল্‌ব!

হ। তোমার সঙ্গে সুখ দুঃখের অনেক কথা আছে ভাই—সে সব কথা পরে হবে—আগে একটা কাজের কথা বলে নিই।

হু। (পুলকিত হইয়া) কাজের কথা অনেকক্ষণ শুনিনি ভাই—বল, শুনে কান জুড়োক।

(শালের মধ্য হইতে হরশঙ্করের খাতা বাহির করণ।)

হু। ও কি ও, খাতা বেরোয় যে!

হ। আমাদের পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা সভা—

হু। (চমকিত হইয়া) সভা!

হ। সভাই বটে। তা কিছু চাঁদার জন্যে—

হু। চাঁদা! দেখ, তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের প্রণয় কিন্তু ঐ কথাটা যদি আমার সাম্‌নে উচ্চারণ কর তাহলে চিরকালের মত চটাচটি হবে—তা বলে রাখ্‌চি।

হ। বটে! তুমি কোথাকার খড়গেছের "গানোন্নতি" সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান কর্‌তে পার আর বন্ধুর অনুরোধে পাঁচ টাকা সই করতে পার না! কোন্ পাষণ্ড নরাধম এখেনে আর পদার্পণ করে!

(সবেগে প্রস্থান।)

(খাতা হস্তে একব্যক্তির প্রবেশ।)

হু। খাতা! আবার খাতা! পালাও-পালাও।

খাতাবাহক। (ভীত হইয়া) আমি নন্দলাল বাবুর—

হু। নন্দলাল ফন্দলাল বুঝিনে পালাও এখনি!

খা। আজ্ঞে সেই টাকাটা।

হু। আমি টাকা দিতে পারব না। বেরোও বেরোও।

(খাতাবাহকের পলায়ন।)

কেরাণী। মশায় করলেন কি! নন্দলাল বাবুর কাছ থেকে আপনার পাওনার টাকাটা নিয়ে এসেচে। ও টাকাটা আদায় না হলে আজ যে চল্‌বে না।

হু। কি সর্ব্বনাশ! ওকে ডাক ডাক ডাক।

(কেরাণীর প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ।)

কে। সে চলে গেছে—তাকে পাওয়া গেল না।

হু। বিষম দায় দেখ্‌চি।

(তম্বুরা হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ।)

হু। কি চাও।

তম্বুরা। আপনার মত এমন রসজ্ঞ কে আছে। গানের উন্নতির জন্য আপনি কি না করচেন! আপনাকে গান শুনাব। (তৎক্ষণাৎ তম্বুরা ছাড়িয়া গান।)

ইমনকল্যান।

জয় জয় হুকড়ি দত্ত—
ভুবনে অনুপম মহত্ত—ইত্যাদি—

হু। আরে কি সর্ব্বনাশ থাম্ থাম্!

তম্বুরা হস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ।

দ্বি। ও গানের কি জানে মশায়। আমার গান শুনুন—

হুকড়ি দত্ত তুমি ধন্য
তব মহিমা কে জানিবে অন্য—

প্রথম। জয়-অ-জ-অ-অ-য়-অ অ—

দ্বি। হু-উ-উ-উ-উ-উ কড়ি-ই-ই—

প্র। হুক-অ-অ-অ—

দ্বি। দ-অ-অ-অ—

হু। (কানে আঙ্গুল দিয়া) আরে গেলুম, আরে গেলুম।

বাঁয়া তবলা লইয়া বাদকের প্রবেশ।

বা। মশায়, সঙ্গৎ নেই, গান! সে কি হয়!

(বাদ্য আরম্ভ।)

দ্বিতীয় বাদকের প্রবেশ।

বা। ও বেটা সঙ্গতের কি জানে! ও ত বাঁয়া ধরতেই জানে না।

প্রথম গায়ক। তুই বেটা থাম্—

দ্বিতীয়। তুই থাম্ না।

প্র। তুই গানের কি জানিস্!

দ্বি। তুই কি জানিস্!

(উভয়ে মিলিয়া—ওড়ব খাড়ব প্রণব নাদ উদারা মুদারা তারা লইয়া তর্ক—অবশেষে তম্বুরায় তম্বুরায় লড়াই।)

(দুই বাদকে মুখে মুখে বোল কাটাকাটি ধ্রেকেটে দেখে ঘেনে গেধে ঘেনে—অবশেষে তব্‌লায় তব্‌লায় যুদ্ধ)

(দলে দলে গায়ক বাদক ও খাতাহস্তে চাঁদাওয়ালার প্রবেশ।)

১। মশায় গান—

২। মশায় চাঁদা—

৩। মশায় সভা—

৪। আপনার বদান্যতা—

৫। ইমন কল্যাণের খেয়াল—

৬। দেশের মঙ্গল—

৭। সরি মিঞার টপ্পা—

৮। আরে তুই থাম্ না বাপু—

৯। আমার কথাটা বলে নিই একটু থাম না ভাই।

(সকলে মিলিয়া হুকড়ির চাদর ধরিয়া টানাটানি) শুনুন্ মশাই—

আমার কথা শুনুন্ মশাই—ইত্যাদি।

হু। (সকাতরে কেরাণীর প্রতি) আমি মামার বাড়ি চল্লুম। কিছুকাল সেখেনে গিয়ে থাক্‌ব। কাউকে আমার ঠিকানা বোলো না।

(দ্রুত প্রস্থান।)

(গৃহমধ্যে সমস্ত দিন গায়ক বাদকদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, বিবাদ মিটাইতে গিয়া সন্ধ্যাকালে আহত হইয়া কেরাণীর পতন।)

চিরঞ্জীবেষু।

ভায়া! আমাদের সে কালে পোষ্টাপিসের বাহুল্য ছিল না—জরুরি কাজের চিঠি ছাড়া অন্য কোন প্রকার চিঠি হাতে আসিত না, এই জন্য সংক্ষেপ চিঠি পড়াই আমাদের অভ্যাস। তা ছাড়া বুড়ামানুষ প্রত্যেক অক্ষর বানান করিয়া করিয়া পড়িতে হয়; বড় চিঠি পড়িতে ডরাই—সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তোমার চিঠি পড়িয়া দীর্ঘ পত্র

পড়ার দুঃখ আমার সমস্ত দূর হইল। তুমি যে সহৃদয়তাপূর্ণ চিঠি লিখিয়াছ, তাহার সমালোচনা করিতে বসিতে আমার মন সরিতেছে না; কিন্তু বুড়া মানুষের কাজই সমালোচনা করা। যৌবনের সহজ চক্ষুতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যগুলিই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু চশমার ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলা খুঁৎ এবং খুঁটিনাটি চখে পড়ে।

বিদেশে গিয়া যে, বাঙ্গালী জাতির উন্নতি-আশা তোমার মনে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহার গুটিকতক কারণ আছে। প্রধান কারণ—এখানে তোমার অজীর্ণ রোগ ছিল, সেখানে তোমার খাদ্য জীর্ণ হইতেছে, এবং সেই সঙ্গে ধরিয়া লইতেছ যে, বাঙ্গালী মাত্রেরই পেটে অন্ন পরিপাক পাইতেছে—এরূপ অবস্থায় কাহার না আশার সঞ্চার হয়! কিন্তু আমি অম্লশূল পাড়ায় কাতর বাঙ্গালী সন্তান—তোমার চিঠিটা আমার কাছে আগাগোড়াই কাহিনী বলিয়া ঠেকিতেছে। পেটে আহার জীর্ণ হওয়া এবং না হওয়ার উপর পৃথিবীর কত সুখ দুঃখ মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। পাকযন্ত্রের উপর যে উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই সে উন্নতি ক' দিন টিঁকিতে পারে! জঠরানলের প্রখর প্রভাবেই মনুষ্য জাতিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। যে জাতির ক্ষুধা কম, সে জাতি থাকিলেও হয় গেলেও হয় তাহার দ্বারা কোন কাজ হইবে না। যে জাতি আহার করে অথচ হজম করে না, সে জাতি কখনই সদ্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

বাঙ্গালী জাতির অম্ল রোগ হইল বলিয়া বাঙ্গালী কেরাণীগিরি ছাড়িতে পারিল না। তাহার সাহস হয় না, আশা হয় না, উদ্যম হয় না। এজন্য বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের শরীর অপটু, বুদ্ধি অপরিপক্ক, উদরায় ততোধিক। অতএব সমাজ-সংস্কারের ন্যায় পাকযন্ত্রসংস্কারও আমাদের আবশ্যক হইয়াছে।

আনন্দ না থাকিলে উন্নতি হইবে কি করিয়া! আশা উৎসাহ সঞ্চয় করিব কোথা হইতে! অকৃতকার্য্যকে সিদ্ধির পথে বার বার অগ্রসর করিয়া দিবে কে! আমাদের এই নিরানন্দের দেশে উঠিতে ইচ্ছা করে না, কাজ করিতে ইচ্ছা করে না, একবার পড়িয়া গেলেই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। প্রাণ না দিলে কোন কাজ হয় না—কিন্তু প্রাণ দিব কিসের পরিবর্ত্তে! আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইবে কে! আনন্দ নাই—আনন্দ নাই! দেশে আনন্দ নাই! জাতির হৃদয়ে আনন্দ নাই! কেমন করিয়া থাকিবে! আমাদের এই স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র শীর্ণ দেহ, অম্লশূলে বিদ্ধ, ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ—রোগের অবধি নাই—বিশ্বব্যাপিনী আনন্দ সুধার অনন্ত প্রস্রবণধারা আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না—এই জন্য নিদ্রা আর ভাঙ্গে না, একবার শ্রান্ত হইয়া পড়িলে শ্রান্তি আর দূর হয় না—একবার কার্য্য ভাঙ্গিয়া গেলে কার্য্য আর গঠিত হয় না—একবার অবসাদ উপস্থিত হইলে তাহা ক্রমাগতই ঘনীভূত হইতে থাকে।

অতএব কেবল মাতিয়া উঠিলেই হইবে না, সেই মত্ততা ধারণ করিয়া রাখিবার,

সেই মত্ততা সমস্ত জাতির শিরার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার ক্ষমতা সঞ্চয় করা চাই। একটি স্থায়ী আনন্দের ভাব সমস্ত জাতির হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধমূল হওয়া চাই। এমন এক প্রবল উত্তেজনা শক্তি আমাদের জাতি-হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে অহরহ দণ্ডায়মান থাকে যাহার আনন্দ-উচ্ছ্বাস বেগে আমাদের জীবনের প্রবাহ সহস্র ধারায় জগতের সহস্র দিকে প্রবাহিত হইতে পারে। কোথায় বা সে শক্তি! কোথায় বা তাহার দাঁড়াইবার স্থান! সে শক্তির পদ ভারে আমাদের এই জীর্ণদেহ বিদীর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

আমিত তাই ভাবিয়া রাখিয়াছি, যে দেশের আব্ হাওয়ায় বেশী মশা জন্মায় সেখানে বড় জাতি জন্মিতে পারে না। এই আমাদের জলা জমি জঙ্গল এই কোমল মৃত্তিকার মধ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর প্রবল সভ্যতার স্রোত আসিয়া আমাদের কাননবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন নিভৃত ক্ষুদ্র কুটীর গুলি কেবল ভাঙ্গিয়া দিতেছে মাত্র। আকাঙ্খা আনিয়া দিতেছে কিন্তু উপায় নাই—কাজ বাড়াইয়া দিতেছে কিন্তু শরীর নাই—অসন্তোষ আনিয়া দিতেছে কিন্তু উদ্যম নাই। আমাদের যে স্বস্তি ছিল তাহা ভাসাইয়া দিতেছে—তাহার পরিবর্ত্তে যে সুখের মরীচিকা রচনা করিতেছে তাহাও আমাদের দুষ্প্রাপ্য। কাজ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধি নাই কেবল অহর্নিশি শ্রান্তিই সার। আমার মনে হয় তার চেয়ে আমরা ছিলাম ভাল—আমাদের সেই স্নিগ্ধ কাননচ্ছায়ায়, পল্লবের মর্ম্মর শব্দে, নদীর কলস্বরে, সুখের কুটীরে স্নেহ শীল পিতামাতা, পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্বজন বৎসল পুত্র কন্যা, পরিবার-প্রতিম পরিচিত প্রতিবেশীদিগকে লইয়া যে নিরুপদ্রব নীড়টুকু রচনা করিয়াছিলাম, সে ছিলাম ভাল। য়ুরোপীয় বিরাট সভ্যতার পাষাণ উপকরণ সকল আমরা কোথায় পাইব! কোথায় সে বিপুল বল, সে শ্রান্তিমোচন জল বায়ু, সে ধুরন্ধর প্রশস্ত ললাট! অবিশ্রাম কর্ম্মানুষ্ঠান—বাধাবিঘ্নের সহিত অবিশ্রাম যুদ্ধ—নূতন নূতন পথের অনুসন্ধানে অবিশ্রাম ধাবন—অসন্তোষানলে অবিশ্রাম দাহন—সে আমাদের এই প্রখর রৌদ্রতপ্ত আর্দ্রসিক্ত দেশে জীর্ণশীর্ণ দুর্ব্বল-দেহে পারিব কেন? কেবল আমাদের শ্যামল শীতল তৃণনিবাস পরিত্যাগ করিয়া আমরা পতঙ্গের মত উগ্র সভ্যতানলে দগ্ধ হইয়া মরিব মাত্র।

বালকেরা শুনিবে এবং বৃদ্ধেরা বলিবে এই জন্য তোমাদের কাছে সংক্ষেপ চিঠি প্রত্যাশা করি কিন্তু নিজে বড় চিঠি লিখি। অর্ব্বাচীনদের কথা ধৈর্য্য ধরিয়া বেশাক্ষণ শুনিতে পারি না—কিন্তু নিজের কথা বলিয়া তৃপ্তি হয় না—অতএব "নিজে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে" বাইবেলের এই উপদেশানুসারে আমার সহিত কাজ করিও না—আগে হইতে সতর্ক করিয়া দিলাম।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীষষ্ঠিচরণ দেবশর্ম্মণঃ।

খবরাখবর।

ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। পার্লেমেণ্টে সর্ব্বসুদ্ধ এখন ৬৭০ জন সভ্য। তন্মধ্যে এবার লিবারেলের সংখ্যা ৩৩২, কন্সার্ভেটিভের সংখ্যা ২৫২, এবং পার্ণেলানুচরের সংখ্যা ৮৬ হইল। আগে ইংলণ্ডে দুটিমাত্র রাজনৈতিক সম্প্রদায় ছিল—লিবারেল বা গতিশীল ও কন্সার্ভেটিভ বা স্থিতিশীল। কি ইংলণ্ডীয়, কি স্কটলণ্ডীয়, কি আয়র্লণ্ডীয়, সকল সভ্যই উক্ত দুদলের এক দলভুক্ত হইতেন। এখন পার্লেমেণ্টে তিনটি দল—নূতন দলটির নাম আইরিশ ন্যাশনালিষ্ট্‌স্ বা পার্ণেলাইট্‌স্। ইহাঁদিগের নাম আইরিশ ন্যাশনালিষ্টস্ হইয়াছে কেননা ইহাঁরা আয়র্লণ্ডের জন্য ন্যাশানাল বা স্বজাতীয় পার্লেমেণ্ট চাহেন—ইহাঁরা সকলেই আয়র্লণ্ডবাসী; ইহাঁরা চাহেন যে আয়র্লণ্ডের আইন কানুন করিবার জন্য কেবল আয়র্লণ্ডবাসিগণের এক পার্লেমেণ্ট ডাব্লিনে বসে—ব্রিটিষ পার্লেমেণ্টের তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব না থাকে। পার্ণেল্ সাহেব ইহাঁদের নেতা, এই জন্য ইহাঁদিগকে ইংলণ্ডীয়েরা পার্ণেলাইট বলিয়া থাকে। আমাদিগের যদি নিতান্ত স্মৃতিবিভ্রম না ঘটিয়া থাকে তবে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে এখন ১০১ জন আইরিশ সভ্য বসিয়া থাকেন—ইহাঁর মধ্যে এবার ৮৬ জন পার্ণেলের অনুচর—১৫ জন মাত্র তাঁহার বিপক্ষে। এই ১৫ জন ঘোর কন্সার্ভেটিভ, এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ানদের মত কন্সার্ভেটিভ। ইহার কারণ এই—ক্রমোয়েল্ যখন আয়র্লণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে ইংলণ্ডের অধিকারে আনেন তখন আয়র্লণ্ডকে ইংলণ্ডের চরণে দৃঢ়বদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি ইংরেজ পরিবার সে দেশে বসান। এই অতি-কন্সার্ভেটিভরা সেই ইংলণ্ডের নিমক খেকো আর আয়র্লণ্ডের রক্তশোষক দলের বংশধর। ইহারা চাহে যে আয়র্লণ্ড চিরকালই ইংলণ্ডের পদানত থাকে। ইহাদিগকে আয়র্লণ্ডীয়েরা ঘৃণা করে—ইহারা অরেঞ্জমেন্ নামে খ্যাত। সমস্ত আয়র্লণ্ডই যে এখন জাতীয় পার্লেমেণ্ট চাহে তাহার প্রমাণ এই যে আয়র্লণ্ডে বহুসংখ্যক অরেঞ্জমেন্ থাকিতেও একজন বই সে শ্রেণীর সভ্য এবার নির্ব্বাচিত হয় নাই। এখন পার্ণেল্‌ই পার্লেমেণ্টের কর্ত্তা বলিতে হইবে। কেননা লিবারেল্ সভ্য কন্সার্ভেটিভ সভ্য সংখ্যা হইতে অনেক বেশী হইলেও পার্ণেলের সহায়তা ভিন্ন লিবারেলেরা দুদিনও গভর্ণমেণ্টের কার্য্য চালাইতে পারিবেন না। কন্সার্ভেটিভরা তো পার্ণেলের সাহায্য না পাইলে দাঁড়াইতেও পারেন না। পার্ণেল বলিতেছেন আয়র্লণ্ডকে যে দল জাতীয় পার্লেমেণ্ট দিতে প্রতি-

শ্রুত হইবে সে দলকেই তিনি সমর্থন করিবেন। লিবারেল ও কন্সার্ভেটিভ দল উভয়েই মহাসমস্যায় পড়িয়াছেন—কিরূপে এ সমস্যা তাঁহারা পূরণ করেন দেখা যাক্।

লালমোহন বাবুর পরাজয়ের সংবাদ তো আমরা গতবারেই দিয়াছি। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইভেলিন্ সাহেবের ভোট অল্পই বেশী হইয়াছিল। ডেটফোর্ডের আইরিশ শ্রমজীবিরা পার্ণেল সাহেবের আদেশ মতে লিবারেলদলের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিল বলিয়াই নাকি লালমোহন বসু পরাজিত হইয়াছেন। আর অনেকে একথাও বলিতেছেন যে ভোট গণনা অন্যায়রূপে হইয়াছে—ভোট গণনাতে চুরিচামারি না থাকিলে লালমোহন বাবুরই জয় হইত। যাহা হউক লর্ডরীপণ প্রভৃতির মত লোকে বলিতেছেন যে লালমোহন বাবু অসাধারণ যোগ্যতা দেখাইয়াছেন, আর তিনি নিঃসন্দেহ দু দিন আগে হউক আর পরে হউক পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিতে পারিবেন। লালমোহন বাবুর উৎসাহ ও পরিশ্রমশীলতা কত তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি—প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব দিন তিনি ১৩টা সভায় ১৩টা বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও কলিকাতা হইতে যে প্রতিনিধিরা বিলাত গিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রতিনিধিরা সকলেই যোগ্যতার সহিত আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা কি তিন প্রেসিডেন্সী হইতে তিন জন প্রতিনিধি স্থায়ী ভাবে বিলাতে রাখিতে পারি না? রাখা যে আবশ্যক সে বিষয়ে মতভেদ নাই। আমাদের আর একটি কাজ অবশ্য কর্ত্তব্য—আমাদের বিলাতে একখানি ভারতীয় সংবাদপত্র স্থাপন করা উচিত। আমাদিগের দেশের ধনবানেরা যদি ইচ্ছা করেন অনায়াসে এ দুটি কাজই করিতে পারেন।

ব্রহ্মদেশ ইংরেজরাজ্যভুক্ত হইল ইংলণ্ড ঘোষণা করিয়াছেন। অনেকগুলি ইংরেজ গরীব ব্রহ্মদেশীয়দের অর্থে নবাবি করিবার সুবিধা পাইল। ব্রহ্মদেশীয়েরা এখন ২০ টাকা মাহিয়ানায় কেরাণীগিরি করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গসুখ ভোগ করিবার অধিকারী হইল। এঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ পত্রেরা বলিতেছেন ব্রহ্মদেশীয়েরা পরম আহ্লাদে ইংরেজ রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছে—তাহারা থীবোকে রাক্ষসের মত ঘৃণা ও ভয় করিত। এ কথার প্রমাণ কি না দেখ পাইওনিয়রের মাণ্ডালের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে যখন থীবোকে তাঁহার রাজপ্রাসাদ হইতে ইংরেজ বন্দী করিয়া লইয়া যায় তখন সমস্ত মাণ্ডেলে নগরীর স্ত্রী পুরুষ রাস্তার দুধারে জড় হইয়া উচ্চে রোদন করিয়াছিল। আর একটা প্রমাণ এই যে এখন ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই দলে দলে ব্রহ্মদেশীয়েরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে ডাকাত ও রাজদ্রোহী সংজ্ঞা দিয়া ধর্ম্ম বুদ্ধিকে বিধিমতে সান্ত্বনা দিতেছেন।

বাল্গেরিয়া ও সার্ভিয়াতে সন্ধিস্থাপনের আয়োজন হইতেছে। বাল্গেরিয়ার সহিত পূর্ব্ব রোমালীয়া মিলিত হইবে। বর্লিন সন্ধিপত্রের সময় পূর্ব্ব রোমালীয়াকে বাল্গে-

রিয়ার সহিত মিলিত হইতে দিলে এ যুদ্ধটা আর হইত না। এখন যুদ্ধের অবসান হইয়াছে।

ব্রোচে তলবিয়াদের হাঙ্গামার কথা সকলেই শুনিয়াছেন। তলবীয়ারা একটি মুসলমান সম্প্রদায়। ইহারা অশিক্ষিত ও কুসংস্কার পূর্ণ। ইহাদিগের প্রধান গুরু ইতি-মধ্যে এক নিশান খাড়া করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন ইংরেজ রাজত্ব কাল পূর্ণ হইয়াছে—তাঁহার শিষ্যেরা ভারতবর্ষ অনিংরেজ করিবে—ইংরেজের গুলিগোলা তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিবে না। ইহারা কলেক্টর সাহেবকে মারিয়া ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস আরম্ভ করিবে কল্পনা করে। কল্পনা করিয়া কলেক্টর সাহেবের বাঙ্গলার অভিমুখে চলে। পথিমধ্যে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রেস্‌কট্ সাহেবকে দেখিতে পায়—তাঁহাকে খুন করে। এইখানেই ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস চেষ্টা শেষ হয়। এখন তলবিয়াদিগের বিচার হইয়া সাজা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ইহা হইতে এই শিক্ষা করা উচিত যে কোন অন্যায় বা অত্যাচার হইলে যাহারা সে বিষয়ে আবেদন পত্র পাঠায়, বা বক্তৃতা করে, বা খবরের কাগজে লেখে, তাহারা আসলে ইংরেজের শত্রু নয়—যাহারা মূর্খ, যাহারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তাহারাই গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কারণ—কেন না তাহারা কোন অন্যায় বা অত্যাচার হইলে তাহার প্রতিবিধানের উপায় দেখিতে পায় না—অস্ত্রোত্তোলনেই তাহারা একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ উপায় দেখিতে পায়। শিক্ষার বিস্তার হইলে ইংরেজের ভয় রহিবে না।

সার্ রিচার্ড গার্থ অনেক দিন হইতে অসুস্থ—তিনি ছুটির চেষ্টা অনেক দিন করিতে-ছেন—কিন্তু এত দিন ছুটি পান নাই। তাহার কারণ অতি বিস্ময়কর। রমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের সিনিয়ার জজ—সার্ রিচার্ড গার্থ ছুটিতে গেলে রমেশ বাবুকে চিফ জষ্টিসের স্থান দিতে হয়, কেন না নিয়ম এই যে এক্‌টিং কাজের জন্য বাহির হইতে অন্য কেহ আসিবে না। লর্ড রীপণ এই এক্‌টিং কাজ একবার রমেশ বাবুকে দিয়া-ছিলেন—এখন আর সে ধর্ম্মাত্মা রীপণ ভারতের কর্ত্তা নাই—রমেশ বাবুকে চিফ্ জষ্টিসের কাজে কিয়ৎকালের জন্য বসানও এখন হইতে পারে না। তাই সার রিচার্ড গার্থ এত দিন ছুটি পান নাই। এ দিগে সার্ রিচার্ডকে ছুটি না দিলেও নয়। এই সমস্যা এইরূপে পূরণ হইয়াছে শোনা যায়। সার রিচার্ডের পেন্সনের সময় হয় নাই—তবু তাঁহাকে পুরা পেন্সন্ দিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে—তিনি কাজ ছাড়িয়া যাইবেন। আর একজন স্থায়ী চিফ জষ্টিস নিযুক্ত হইবে—অবশ্য ইংরেজ হইবে—কেন না নিয়মানুসারে স্থায়ী চিফ জষ্টিস্ সাম্রাজ্ঞী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবেন। চিফ জষ্টিসের পদ খালি হইলে সিনিয়ার জজকে সে পদ দিতে হইবে এমন নিয়ম নাই—চিফ জষ্টিস্ ছুটি লইলে সে এক্‌টিং পদ সিনিয়ার জজকে দিতে হইবে নিয়ম আছে। তাই সার রিচার্ডকে ছুটি না দিয়া এখনই পূরা পেন্সন দিয়া পাঠান হইতেছে। কাল চামড়ার অপরাধ এমনই।

এবার ভারতবর্ষে ক্রিস্‌মাসের সময়ে নানা স্থানে জাতীয় সম্মিলনী সভা হইয়াছিল। বোম্বায়ের ন্যাশনাল কংগ্রেস হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতা মান্দ্রাজ পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা ও মান্দ্রাজের সভায়ও ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের কি কি হইলে রাজনৈতিক উন্নতি ও মঙ্গল হইতে পারে সে সব প্রশ্নের আন্দোলন হইয়াছিল। আগামী বৎসর একটি মাত্র সম্মিলনী সভা হইবে—সে সভা কলিকাতায় হইবে।

ইংলণ্ড যুদ্ধ করিবেন, আমরা খরচ দিব, ইহা পুরাতন কথা। গবর্ণমেণ্টের টাকার দরকার হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আয় কর (Income tax) বসান স্থির করিয়াছেন। এ বৎসর হইতেই আমাদিগকে এ নূতন করটি দিতে হইবে। শতকরা গড়ে ২ টাকা হিসাবে কর দিতে হইবে। ৫০০ টাকার নীচে যাহাদিগের বার্ষিক আয় তাহাদিগকে দিতে হইবে না।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

বোম্বাই সহর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উৎসব — বোম্বায়ে হিন্দু মুসলমান পারসী খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কত প্রকার উৎসবের উৎস উঠে তাহার অন্ত নাই। মুসলমানদের

মহরম — প্রধান উৎসব মহরম। ইহা আলি ও ফতেমার পুত্র দ্বয় হসন হুসেনের শোচনীয় মৃত্যু স্মরণোদ্দীপক বার্ষিক উৎসব। দশ দিন ইহার বিস্তৃতি—দশম দিনে হুসেনের সমাধি মন্দির (তাবুৎ) সমুদ্রে বিসর্জ্জিত হয়। সিয়া মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে আলীই মহম্মদের ন্যায্য সিংহাসনাধিকারী ইমাম। তাঁহার অভাগা পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু স্মরণ করিয়া মহরমের সময় তাহাদের আর্ত্তনাদের সীমা থাকে না। সুন্নী মুসলমানেরাও মহরমে যোগ দেয় কিন্তু এ তাহাদের আনন্দোৎসব। এক দলের হাহাকারের মধ্যে অপর দলের মহোল্লাস। মহরমের সময় সিয়া সুন্নীদের ঘোর দলাদলির মধ্যে শান্তিরক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার আবার কখন কখন এই সময়ে হিন্দুর পরব আসিয়া পড়িলে হিন্দু মুসলমানের জাতীয় বৈর প্রজ্বলিত হইয়া মহা দাঙ্গা হাঙ্গাম বাধিয়া যায়। বোম্বায়ে যে মহরমের সময় শান্তিভঙ্গ হয় না সে কেবল পুলিসের লোকদের অনিবারিত যত্ন ও দক্ষতা গুণে। বোম্বায়ে সিয়া মুসলমান বিস্তর সুতরাং এখানে যেমন মহরমের ধুম অন্যত্রে প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। শেষ দিনে হুসেন বধ নাটক

অভিনীত হইয়া থাকে। হুসেন তাঁহার সেনামণ্ডলী-পরিত্যক্ত ও অরিদলে বেষ্টিত হইয়া কয়েক জন বিশ্বাসী অনুচরের সহিত করবালা সমরক্ষেত্রে সমাগত। তাঁহার প্রিয়তমা ভগিনী ফতেমা তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রা হইতে নিবারণ করিতে কাতরস্বরে কত অনুনয় করিতেছেন কিন্তু হুসেন কিছুতেই নিবারিত হইবার নহেন। তিনি বলিলেন "ঈশ্বরই একমাত্র ভরসা। আমার পিতা মাতা ভ্রাতা যেখানে গিয়াছেন আমিও তথায় তাঁহাদের পশ্চাদগামী হইব ইহাতে দুঃখ কি?" তাঁহার বিশ্বাসী সঙ্গীগণ একে একে শত্রু হস্তে নিহত—সব শেষে হুসেনও তরবারি ও বর্ষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড সেনাপতি সম্মুখে আনীত হইলে সেনাপতি মুখের উপর এক বেত্রাঘাত করিল। ইহা দেখিয়া একজন বৃদ্ধ মুসলমান বলিয়া উঠিল "আহা! এই মুখে আমি কতবার মহম্মদের চুম্বন দেখিয়াছি!" যে নাটকের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই ঘটনা অনুসরণ করিয়া অভিনীত হয়। মহরম ভিন্ন মুসলমানদের কত পীরের মেলা ও উৎসব, হিন্দুদিগের কত পূজা পার্ব্বন আছে। বোম্বাই মেলারই রাজ্য।

হিন্দুদের উৎসব অনেকটা আমাদেরই মত—তথাপি কোন কোন অংশে প্রভেদ উপলব্ধি করা যায়। বাঙ্গালার দুর্গোৎসব এদেশীয় হিন্দুদের জাতীয় উৎসব বলিয়া মনে হয় না। যদিও নবরাত্রি উপলক্ষে কোন কোন হিন্দু গৃহে দুর্গাপূজা হয় ও গুজরাতী রমণীদিগের মধ্যে 'গরবা' গানের ধুম লাগিয়া যায় তথাপি ইহা বোম্বাইবাসীদের জাতীয় উৎসবের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। দশমীর দিন (দশাহরা) শারদোৎসবের প্রধান দিন। সে দিন মুম্বাদেবী ও ভুলেশ্বর মন্দিরে দেবী দর্শনের মহাভীড়—হিন্দু গৃহে আত্মীয় স্বজন বন্ধুর পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও স্বর্ণচ্ছলে শমীপত্রের আদান প্রদান হইয়া থাকে। কথিত আছে পাণ্ডবেরা বিরাট রাজ্যে প্রবেশ কালে সেই দিন শমীবৃক্ষতলে অস্ত্র শস্ত্র রাখিয়া শমী পূজা করিয়াছিলেন। পাণ্ডবদের দৃষ্টান্তে এ অঞ্চলে বিজয়া দশমীতে শমী পূজার রীতি প্রচলিত। সিন্ধুদেশেও এই প্রথা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গ্রামের বাহিরে লোকেরা শমী বৃক্ষতলে মিলিত ও স্বর্ণ জ্ঞানে আগ্রহের সহিত শমীপত্রের আদান প্রদানে তৎপর হয়। মহারাষ্ট্রদেশে দশাহরার বিশেষ মাহাত্ম্য। এই সময়ে বর্গীরা শস্ত্রার্চ্চনা করিয়া মহা ধুমধামে যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইত। দশাহরায় অশ্ব সকল বিচিত্র ফুলহারে সজ্জিত হয় ও নীচ জাতীয় লোকেরা মেষ মহিষাদি বলিদানে মাতিয়া যায়।

দশাহরা (margin)

দশাহরার পর দেওয়ালী। তাহাই পুরবাসীদের প্রধান উৎসব। এই উৎসবের বিশেষ গুণ এই যে ইহুদি ও খৃষ্টান ভিন্ন অপর সাধারণ সকল সম্প্রদায়ের লোকে ইহাতে যোগ দিয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান পারসী সকলেই নিজ নিজ গৃহ দীপালোকে আলোকিত করিয়া দীপাবলীর উৎসবে মগ্ন হয়। ধন ত্রয়োদশী হইতে এই উৎসবের আরম্ভ ও অমাবস্যায় শেষ। বঙ্গদেশে কালী পূজার

সময় এই। কিন্তু এখানে এ উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী। নৃমুণ্ডমালিনী শম্ভুবক্ষবিহারিণী লোলজিহ্ব কালী নহে। অমাবস্যার দিন বিক্রম সম্বৎসরের শেষ দিন, সেই দিনই উৎসবের প্রধান দিন। গৃহে গৃহে দীপমালায় মুম্বাপুরী সজ্জিত রঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভন দৃশ্য ধারণ করে। সে দিন বণিকদের বহি-পূজনে মহা উৎসাহ। তাহারা তাহাদের পুরাতন হিসাব পত্র গুটাইয়া দান ধ্যান দেবার্চ্চনা পূর্ব্বক নবোৎসাহে নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

নারেল পুণম } আর একটী উৎসব বোম্বাইবাসীদিগের বিশেষ সেব্য তাহা শ্রাবণী পূর্ণিমা (নারেল পুণম)। এই সময় বর্ষা ঋতুর অবসান বলিয়া ধার্য্য। হিন্দুগণ ছোট বড় সকলে সাজসজ্জা করিয়া নারিকেল ও পুষ্পহস্তে সমুদ্রতীরাভিমুখে বাহির হয়। ময়দান লোকে লোকারণ্য। এই সময় হইতে নাবিকদের জন্য (দিশি নাবিক; P and O Company নয়) সমুদ্র পথ উন্মুক্ত—শুভযাত্রা উদ্দেশে ফল ফুল উপহার সমুদ্রের সাধ্যসাধনা আরাধনা করিতে হয়। ব্যাক্‌বের তীরে লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে সাগরার্চ্চনায় সম্মিলিত হয়—পুরোহিত প্রস্তুত—চাউল দুধ নারিকেল প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার সকলি যে বরুণদেবের ভোগে আইসে তাহা নয়। নারিকেল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একদল কুলী তাহা সাঁতার দিয়া ধরিতে যায় ও কাড়াকাড়ি করিয়া যে পারে বরুণের ধন লুণ্ঠন করিয়া আনে। সমুদ্র তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন না—বরং অনেক সময় স্বয়ং উদার তরঙ্গ হস্তে তাহা কাঙ্গালীদের বিতরণ করেন। এদিকে ময়দানে মেলা বসিয়া যায়। মহাধুম। কোথাও খেলনা বিক্রী, কোথাও মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে, কোথাও বা একদল পালওয়ানের মল্ল যুদ্ধ চলিতেছে ও মধ্যে মধ্যে জেতার প্রতি দর্শক মণ্ডলীর সাবাসধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কোথাও একদল নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। কাঙ্গালীরা ভিক্ষা আদায়ের জন্য কতপ্রকার ফন্দী করিয়া বেড়াইতেছে। ওদিকে একজন গণক ঠাকুর হাত দেখিয়া শুভাশুভ গণিয়া দিতেছেন; তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিলে বোধ হয় যেন সত্যই দৈব শক্তি তাঁহাতে মূর্ত্তিমতী। অন্যত্রে নাগরদোলায় বালকেরা ঘুরপাক দিতেছে। নানাদিক হইতে লোকের যাতায়াত—সকলেই দু দণ্ডের জন্য আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে তৎপর।

এতদ্ভিন্ন দোলযাত্রা—গণেশ চতুর্থী, নাগপঞ্চমী, গোকুলাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি আর যে সকল হিন্দূৎসব আছে তাহা আর কত বলিব? দোলযাত্রার (হোলির) যে আবীর ক্রীড়া নৃত্য গীত তাহা সর্ব্বত্রই সমান, বর্ণনার আবশ্যক করে না। মহ্লাররাও গাইকওয়াড় অত্যন্ত হোলিভক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে তিনি একবার হাতির উপরে এক ক্ষুদ্র কামান রাখিয়া তাহা হইতে একদল নর্ত্তকীর উপর আবীর বর্ষণ করিয়াছিলেন সেই ভয়ঙ্কর পিচকারীর বলে এক বেচারীর প্রাণ শঙ্কট উপস্থিত। এখন আর এরূপ অত্যাচার শ্রুত হওয়া যায় না। চড়ক পূজায় আত্মনির্য্যাতন পর্য্যন্ত

নিবারিত হইয়াছে। গণেশ চতুর্থীর উৎসবে এপ্রদেশে সামান্য কাণ্ড হয় না। আমি দেখিতে পাই এদেশে গণেশ ঠাকুরের বিশেষ সম্মান। গ্রামে গ্রামে গণপতির মন্দির ও গণেশ চতুর্থীর সময় গজানন মূর্ত্তি পূজা ও বিসর্জনের মহা ঘটা। গণেশের সম্মানার্থে স্বতন্ত্র উৎসব বঙ্গদেশে নাই। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়াকে এদেশে যম দ্বিতীয়া বলে। ভাই বোনের মেলামেশা ও সদ্ভাব বর্দ্ধন এ উৎসবের উদ্দেশ্য। ভ্রাতা ভগ্নী-গৃহে ভোজনার্থে গমন করে। ভগ্নী ভায়ের কপালে তিলক দিয়া তাঁহাকে বরণ করে—অনন্তর ধনরত্ন উপহার দানে ভগ্নীর যত্নের প্রতিদান ও পরিতোষ সাধন করিতে হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

এলিফাণ্টা অথবা ঘারপুরী

যিনি বোম্বায়ে বেড়াইতে আসিয়াছেন তিনি গজদ্বীপ (এলিফাণ্টা) না দেখিয়া যেন বাড়ী না ফেরেন। এই দ্বীপে এলিফাণ্টার অপর নাম ঘারপুরী। যেসকল গুহামন্দির আছে তাহা প্রস্তরময় পাহাড়ে খুদিয়া নির্ম্মিত। চতুর্ম্মন্দিরের মধ্যে একটীই প্রধান তাহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য। আপলো বন্দর হইতে ষ্টীমারে করিয়া এলিফাণ্টা দ্বীপ একঘণ্টায় যাওয়া যায়। বন্দর বোটে করিয়া গেলে আর একটু বেশী সময় লাগে। এই রকম একটা বোটে অনুকূল বায়ুভরে পাল তুলিয়া যাওয়াতে আরাম বটে কিন্তু বাতাস বন্ধ ও স্রোত প্রতিকূল হইলে বোটে যাওয়া আসা অনেক ঘণ্টার ধাক্কা। যাত্রী-দের সুবিধার জন্য বড় বড় পাথর ফেলিয়া সমুদ্রতীর হইতে গুহামুখ পর্য্যন্ত এক সোপান পথ প্রস্তুত কিন্তু ভাঁটার সময় নৌকা কাছে ঘেঁসিতে পারে না—তীর হইতে অনেক দূরে রাখিতে হয়। নামিবার স্থানে পূর্ব্বকালে একটি হস্তীর বিশাল পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি ছিল তাহা হইতেই পোর্ত্তুগীস লোকেরা এই দ্বীপের নামকরণ করিয়াছে। দ্বীপে এই প্রতিমূর্ত্তির চিহ্নমাত্রও এইক্ষণে দৃষ্ট হয় না তাহার ভগ্নাবশিষ্ট পিণ্ড বিক্টোরিয়া উদ্যানে উঠাইয়া রাখা হইয়াছে। সোপানপরম্পরা হইতে উপরে উঠিয়া গুহামন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে কয়েক ধাপ উচ্চে উঠিলে সম্মুখে সুনীল সমুদ্র, সমুদ্রের ক্রোড়ে কশাই দ্বীপ ও দূরে অর্ণবপোতপূর্ণ বোম্বাই বন্দর পর্য্যন্ত অতি মনোহর সুন্দর দৃশ্য আবিষ্কৃত হয়। গুহার প্রবেশ দ্বারটি বেশ বড় ও সারি সারি চারি থাক স্তম্ভের মধ্য দিয়া প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। এই সকল স্তম্ভ প্রকাণ্ড প্রস্তরময় ছাদ-ভার বহন করিতেছে। স্তম্ভের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়া দ্বাচত্বারিংশৎ। তাহার কয়েকটি ভগ্নদশাপন্ন। মন্দিরের প্রবেশ দ্বার হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ১৩০ ফীট দীর্ঘ ও পূর্ব্বদ্বার হইতে পশ্চিম দ্বার পর্য্যন্ত ততটা প্রস্থ।

এই মন্দির এইক্ষণে নিত্যনিয়মিত পূজার কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না—যবনদের দৌরাত্ম্যে অনেককাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি কোন কোন শৈব উৎসবে তথায় হিন্দুযাত্রী

সমাগত দেখা যায় ও শিবরাত্রির সময় এক হিন্দুমেলা প্রবর্ত্তিত হয়। এলিফাণ্টা যে শৈব মন্দির এই মেলার প্রচলনই তাহার প্রমাণ কিন্তু তাহার আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ মন্দিরের অভ্যন্তরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে যে সকল খোদিত মূর্ত্তি বিদ্যমান তাহার অধিকাংশই শৈব মূর্ত্তি। মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র এই সকল পাষাণ মূর্ত্তি 'আধো আলো আধো ছায়া'র মধ্য হইতে দৃষ্টি পথে পতিত হয়। চতুর্দ্বারবিশিষ্ট একটী প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই প্রকোষ্ঠের বাহিরের চারিদিকে দ্বারপালগণ পিশাচের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান। উত্তরদিক হইতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের

ত্রিমূর্ত্তি } ত্রিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মার গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি বিষ্ণু ও মহাদেবের মধ্যে বিরাজিত। তাঁহার এক হস্তে সন্ন্যাসীর পান পাত্র। বক্ষের অলঙ্কারের শিল্প নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। ব্রহ্মার বামে বিষ্ণু দক্ষিণ হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন দক্ষিণে মহেশ্বর—তাঁহার হাস্যদৃষ্টি করস্থিত ফণীফণার উপর নিপতিত। নরকপাল ও বিল্বপত্র তাঁহার শিরোভূষণ।

অর্দ্ধনারীশ্বর } ত্রিমূর্ত্তির দক্ষিণে অর্দ্ধনারীশ্বর। বামার্দ্ধ গৌরী ও দক্ষিণার্দ্ধ মহাদেবের মূর্ত্তি। মহাদেবের চারি হস্তের এক হস্ত নন্দী শৃঙ্গোপরি স্থাপিত। এই মূর্ত্তির দক্ষিণে হংসবাহন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও বামে গরুড় বাহন বিষ্ণু। গরুড় এইক্ষণে ছিন্ন মস্তক। উপরিভাগে ও পশ্চাতে অন্যান্য দেব দেবর্ষিগণ বিরাজ করিতেছে। ইন্দ্রদেব ঐরাবত পৃষ্ঠে আসীন।

হর পার্ব্বতী } ত্রিমূর্ত্তির বামে হরপার্ব্বতীর বিশাল মূর্ত্তিদ্বয়। হরশির হইতে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী অভ্যুদিত। মহাদেব দণ্ডায়মান—তাঁহার বাহু চতুষ্টয়ের এক বাহু জনৈক পিশাচের উপর স্থাপিত তাহার ভারে যেন সে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শিবের দক্ষিণে তাঁহার অন্যান্য অনুচরগণ, তদুপরি ব্রহ্মা ও শিবের মাঝে ঐরাবত বাহন ইন্দ্র। পার্ব্বতী শিবের দিকে ঝুঁকিয়া এক পিশাচীর উপর বাম হস্তে ভর দিয়া আছেন তদুপরি গরুড়াসীন বিষ্ণু। সর্ব্বোপরি ছয়টি মূর্ত্তি তাহার দুইটি নারী অন্যগুলি নরমূর্ত্তি।

ত্রিমূর্ত্তির আরো একটু বামস্থিত পশ্চিম প্রকোষ্ঠে হরপার্ব্বতীর বিবাহ সভায় উপনীত

হরপার্ব্বতীর বিবাহ } হইবে। একজন পুরোহিত লজ্জাশীলা বধূকে আগু বাড়াইয়া দিতেছেন।

গণেশ } অপর দিকের প্রকোষ্ঠে গণেশ জন্মের অভিনয়।

হরপার্ব্বতী কৈলাস পর্ব্বতে একাসনে উপবিষ্ট—আকাশ হইতে তাঁহার উপর দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। পার্ব্বতীর পশ্চাতে একটি বামা একটী শিশু কোলে করিয়া আছে।

কৈলাসতলে রাবণ } দক্ষিণ হইতে উত্তর মুখে ফিরিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে দেখিবে রাবণ কৈলাস পর্ব্বত সরাইয়া লঙ্কায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। কৈলাস অতিদূরে অবস্থিত বলিয়া রাবণের শিব-পূজার ব্যাঘাত হয় তাই তাহা উঠাইয়া নিজ পুরীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা। এদিকে কৈলাশ পর্ব্বত কম্পমান্ দেখিয়া পার্ব্বতী ভয়ে জড়সড়। মহাদেব তাঁহার পদাঙ্গুলি দ্বারা রাবণের শিরোপরি পর্ব্বত এমন জোরে চাপিয়া ধরিলেন যে তাহার তলে দশানন দশসহস্র বৎসর চাপা পড়িয়া থাকেন অবশেষে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত আসিয়া তাঁহার উদ্ধার করেন।

ইহা হইতে পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে গমন করিলে দক্ষযজ্ঞ বৃত্তান্ত খোদিত দেখা যায়।

দক্ষযজ্ঞ } অষ্টভুজ কপালমাল রুদ্রমূর্ত্তি বীরভদ্র দক্ষনিধনে নিযুক্ত—তাঁহার উপরিস্থিত এক লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট দেবগণ হত্যাকাণ্ড সভয়ে দর্শন করিতেছেন। এই লিঙ্গের উপর একটি আকার আছে কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে তাহা ওঁকার প্রতিপাদক চিহ্ন।

ভৈরব ও মহাযোগী } আরো কতক পা চলিয়া গেলে প্রবেশ দ্বারের কাছাকাছি মহাদেবের অষ্টভুজ ভৈরব মূর্ত্তি ও যোগাসনস্থিত মহাযোগী এই মূর্ত্তিদ্বয় দৃষ্ট হইবে।

এই সকল খোদিত মূর্ত্তি কল্পনা-যানে আমাদিগকে দেবসভায় উপনীত করে। কোথাও দ্বারপালগণ যষ্টিহস্তে পিশাচ সঙ্গে দণ্ডায়মান—কোথাও হর-পার্ব্বতীর বিবাহোৎসব—কোথাও তাঁহাদের কৈলাসে ঘরকন্না—কোথাও মহাদেব ভূতগণ সাথে তাণ্ডব নৃত্যে উন্মত্ত—কোথাও তিনি রুদ্রমূর্ত্তি কপালভৃৎ—কোথাও বা ধ্যানমগ্ন মহাযোগী—কোন স্থানে দেখিবে কমলবাহন ব্রহ্মা—কোন স্থানে শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণু—কোথাও ঐরাবতপৃষ্ঠে ইন্দ্রদেব, গণেশ, কার্ত্তিক, কামদেব—তিলকধারী জটায়ু, কৈলাসশিখরতলে রাবণ—কোথাও গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্ত্তিমতী। দুঃখের বিষয় যে খোদিত মূর্ত্তি সকল প্রায় সকলি বিকলাঙ্গ অথবা সম্পূর্ণ রূপে অঙ্গহীন। কালের হস্তে এই মন্দির ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই—দুর্দ্দান্ত মুসলমানদের অত্যাচারেও ইহার অনিষ্টসাধন হয় নাই—ইহার যে এই দুর্দ্দশা পাশ্চাত্য যবন দানবের উৎপীড়নই তাহার কারণ। এই মন্দির পূর্ণ যৌবনে যে কি সুন্দর ছিল তাহার চিত্র কল্পনাতেই রহিয়া যায়।

জন্মকাল { এলিফাণ্টার জন্মকাল নির্ণয় করা সহজ নহে। ইহার প্রবেশ পথে যে শিলালেখ্য ছিল তাহা পোর্ত্তুগীস রাজাজ্ঞায় লিসবনে প্রেরিত হয়—সে সময়ে সে লেখা পাঠ করিয়া কেহই অর্থ করিতে পারে নাই। ইহা এই মন্দিরের প্রাচীনত্বের এক প্রমাণ। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া ইহার বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর অবধারিত করা যাইতে পারে।

রাত্রিতে এই গুহামন্দি র আলোকিত হইলে সুন্দর দেখায়। যুবরাজ প্রিন্স্ ওফ ওয়ে-

যুবরাজের আগমন } লূস্ যখন বোম্বায়ে আগমন করেন তখন তাঁহার সম্মানার্থে এলিফান্টা দ্বীপে এক ভোজ দেওয়া হয় সেই উপলক্ষে গুহাভ্যন্তর দীপালোকে সুন্দর রূপে রঞ্জিত হইয়াছিল। মন্দ নয়। শৈবমন্দিরে ম্লেচ্ছ ভোজ—না জানি দেবদেবীগণ কি ভাবে এই অঘোরকৃত্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

চিঠি।

শ্রীমতী—

প্রাণাধিকাসু।—

চিঠি লিখ্‌ব কথা ছিল,
দেখ্‌চি সেটা ভারি শক্ত।
তেমন যদি খবর থাকে
লিখ্‌তে পারি তক্ত তক্ত।
খবর ব'য়ে বেড়ায় ঘুরে
খবরওয়ালা ঝাঁকা-মুটে।
আমি বাপু ভাবের ভক্ত
বেড়াইনাকো খবর খুঁটে।
এত ধুলো, এত খবর
কল্‌কাতাটার গলিতে!
নাকে চোকে খবর ঢোকে
দু-চার কদম চলিতে।
এত খবর সয়না আমার
মরি আমি হাঁপোষে।
ঘরে এসেই খবর গুলো
মুছে ফেলি পাপোষে।
আমাকেত জানই বাছা!
আমি একজন খেয়ালি।
কথাগুলো যা' বলি, তার
অধিকাংশই হেঁয়ালি।

আমার যত খবর আসে
ভোরের বেলা পূব দিয়ে।
পেটের কথা তুলি আমি
পেটের মধ্যে ডুব দিয়ে।
আকাশ ঘিরে জাল ফেলে
তারা ধরাই ব্যবসা।
থাক্‌গে তোমার পাটের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবু সা।
কল্পতরুর তলায় থাকি
নইগো আমি খবুরে।
হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি
মেওয়া ফলে সবুরে।

তবে যদি নেহাৎ কর
খবর নিয়ে টানাটানি।
আমি বাপু একটি কেবল
দুষ্টু মেয়ের খবর জানি।
দুষ্টুমি তার শোন যদি
অবাক হবে সত্যি।
এত বড় বড় কথা তার
মুখ খানি একরত্তি।
মনে মনে জানেন তিনি
ভারি মস্তলোকটা।
লোকের সঙ্গে না-হক কেবল
ঝগড়া কর্বার ঝোঁকটা।
আমার সঙ্গেই যত বিবাদ
কথায় কথায় আড়ি।
এর নাম কি ভদ্র ব্যাভার!
বড্ড বাড়াবাড়ি।
মনে করেছি তার সঙ্গে
কথাবার্ত্তা বন্দ করি।

প্রতিজ্ঞা থাকে না পাছে
　　সেইটে ভারি সন্দ করি।
সে না হলে সকাল বেলায়
　　চামেলি কি ফুটবে!
সে নৈলে কি সন্ধে বেলায়
　　সন্ধে তারা উঠ্‌বে।
সে না হলে দিনটা ফাঁকি
　　আগাগোড়াই মস্কারা।
পোড়ারমুখী জানে সেটা
　　তাই এত তার আস্কারা।
চুড়ি-পরা হাত দুখানি
　　কতই জানে ফন্দি।
কোন মতে তার সাথে তাই
　　করে আছি সন্ধি।

নাম যদি তার জিগেস কর
　　নামটি বলা হবে না।
কি জানি সে শোনে যদি
　　প্রাণটি আমার রবে না।
নামের খবর কে রাখে তার
　　ডাকি তারে যা খুসি।
দুষ্টু বল দস্যি বল
　　পোড়ারমুখি রাক্ষুসী!
বাপ মায়ে যে নাম দিয়েচে
　　বাপ মায়েরি থাক্‌নে।
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
　　তুলে রাখুন্‌ বাক্সে।
এক জনেতে নাম রাখ্‌বে
　　অন্নপ্রাশনে।
বিশ্ব সুদ্ধ সে নাম নেবে
　　বিষম শাসন এ!

নিজের মনের মত সবাই
করুক নামকরণ।
বাবা ডাকুন্ "চন্দ্রকুমার"
খুড়ো "রামচরণ"!
ধার-করা নাম নেব আমি
হবে না ত সিটি।
জানই আমার সকল কাজে
Originality।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
সংস্কৃত নাম।
এতে কেবল বেড়ে ওঠে
অভিধানের দাম।
আমি বাপু ডেকে বসি
যেটা মুখে আসে,
যারে ডাকি সেই তা বোঝে
আর সকলে হাসে!

দুষ্টু মেয়ের দুষ্টুমি—তায়
কোথায় দেব দাঁড়ি!
অকূল পাথার দেখে শেষে
কলমের হাল ছাড়ি!
শোন বাছা, সত্যি কথা
বলি তোমার কাছে—
ত্রিজগতে তেমন মেয়ে
একটি কেবল আছে!
বর্ণিমেটা কারো সঙ্গে
মিলে পাছে যায়—
তুমুল ব্যাপার উঠবে বেধে
হবে বিষম দায়!
হপ্তাখানেক বকাবকি
ঝগড়াঝাঁটির পালা,

একটু চিঠি লিখে, শেষে
প্রাণটা ঝালাফালা।
আমি বাপু ভাল মানুষ
মুখে নেইক রা।
ঘরের কোণে বসে বসে
গোঁফে দিচ্চি তা।
আমিই যত গোলে পড়ি
শুনি নানান্ বাক্যি।
খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে
আমিই তাহার সাক্ষি।
আমি কারো নাম করিনি
তবু ভয়ে মরি।
গায়ে পেতে নিস পাছে তুই
সেইটে বড় ডরি!
কথা একটা উঠ্‌লে মনে
ভারি তোরা জালাস্।
আমি বাপু আগে থাক্‌তে
বলে হলুম খালাস্!

শ্রীঃ—

নদীয়া ভ্রমণ।

২ নং

তুমি কি ভাব আমি নিতান্তই সার্ব্বজনীনতা এবং সার্ব্বভৌমিকতার প্রেমে পড়ে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি? রাম রাম! আমার ত মনে হয়, সবই আমাদের গরজে ঢেলা বওয়া।

জঠরানল তেমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে ভূমি-বিচার জন-বিচার কে করিয়া থাকে, সুতরাং সহজেই সার্ব্বভৌমিকতা ও সার্ব্বজনীনতাকে আশ্রয় করিতে হয়। আমি নদীয়া জিলাময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি নিজের খোরাকের সুবিধার জন্য—বালকের খোরাক তাহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।

গরজে ঢেলা বহার কথা বলেছিলাম। সে বার গরজে পড়ে পলাসী ভ্রমণ করতে হয়েছিল, এবারও সেইরূপ সদভিসন্ধি প্রণোদিত হয়ে তার কাছাকাছি একটা জায়গায়

গিয়ে পড়তে হয়। তার নাম ডাকাতে কুলবেড়ে। বিষম কুলবেড়েও অনেকে বলে থাকে। ডাকাতের নামে যাঁদের রোমাঞ্চ হয়, তাঁদের বিনোদনের জন্য আমি এখানে প্রসিদ্ধ ডাকাত বিশেবাগদী ওরফে বিশ্বনাথ বাবুর নাম উল্লেখ করলাম। আমাদের মধ্যে রবিন্‌হুডের নাম যাঁহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে এবং সেই ইংরেজকুল তিলকের বীরত্ব কাহিনীতে যাঁরা মুগ্ধ, তাঁরা শুনে একেবারে নিঃসন্দেহ আশ্চর্য্য হয়ে থাকেন যে এই বিশে ডাকাতের কার্য্য কলাপ দস্যুশ্রেষ্ঠ জন্ বুলেরই অনুরূপ। আর এই চৈতন্য রঘুনাথ রঘুনন্দন, কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মভূমি নদীয়া তাকেও অঙ্কে ধারণ করেছিলেন। ভ্রমণ কালে আমি ইহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু কিছু নোট সংগ্রহ করেছি, কিন্তু অতি সামান্য। এসব খবর রাখবার যে অবকাশ ভদ্রলোকেদের তা নাই, সে স্পৃহাও নাই, আমায় নিরক্ষর "ছোট লোকেদের" কাছথেকে অনেক যত্নে খবর নিতে হয়েছে। একটু নমুনা দিই।

বিশ্বনাথ ডাকাইত।

বাড়ী গাড়রা ভাতছালা থানা চাপড়ার ৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে। জাতিতে দুলে বাগ্‌দী। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঁচিয়া ছিল, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ফাঁসি দেন। ঠগবগের খালের মাঠে বাঁশবেড়িয়া কুঠীর দক্ষিণে ফাঁসি হয়। সে ফাঁসিকাঠ আজও রহিয়াছে। ধর্ম্মছেলে বৈদ্যনাথ—জাতিতে গোয়ালা—ষড়যন্ত্র করিয়া ধরাইয়া দেয়। বিশ্বনাথ ফাঁসির আগে বলে গোয়ালাকে কেউ কথন বিশ্বাস করোনা ভাই! তার মা সাহেবের কাছে ছেলের মৃত্যুর পর হাড়গুলি চাহিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই। সাহেবেরা বাক্সবন্দী করিয়া সেগুলি স্থানান্তরিত করেন। মা না কি বলিয়াছিল যে হাড় পাইলে বিশুকে সে আবার বাঁচাইতে পারিবে। বিশ্বনাথ পালকী চড়িয়া ডাকাইতি করিত। লোকে তাহাকে বিশ্বনাথ বাবু বলিয়া ডাকিত। বিশ্বনাথ প্রথমে ভদ্রতা করিয়া ধনী-লোকের কাছে টাকা বা দলবলের রসদ চাহিয়া পাঠাইত বা পত্র লিখিত; না দিলে দিনের বেলাতেই ডাকাতি করিত। ডাকাতির টাকায় দীন দুঃখীর সাহায্য করিত, অপৈতক ব্রাহ্মণের পৈতা দিয়া দিত, কন্যাভারগ্রস্ত ব্রাহ্মণের দায় উদ্ধার করিত। অনেকে তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানিত, সে কালীর বরপুত্র ইত্যাদি। দেখিতে তাহার তেমন বলিষ্ঠ গঠন ছিল না,—ছোটখাট মানুষটী। কাল রং। মুসলমান মেঘা আর গোয়ালা বৈদ্যনাথ প্রধান শিষ্য এবং সহায় ছিল।

ডোমপুখুরিয়ার এক চণ্ডাল—বয়স প্রায় পঞ্চাশ—সে বলিল তাহার পিতামহের মুখে শুনিয়াছে তাহাদের বাড়ীতে বিশ্বনাথ একবার আড্ডা করিয়াছিল। সেই সময় একদিন এক ব্রাহ্মণ প্রাণের ভয়ে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের বাড়ীতে আশ্রয় লয় এবং কাঁদিয়া বলে যে পথে ডাকাইতে তার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। বিশ্বনাথ বুঝিল তাহার দলের

লোকের এই কাজ। তখন ব্রাহ্মণের যাহা অপহৃত হইয়াছিল তার ডবল দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া তাহাকে বিদায় দেয়।”

নিজ ডাকাতে কুলবেড়ে এরূপ বীর প্রসবিনী কিনা সে সম্বাদ পাই নাই, কিন্তু এ স্থান ডাকাতের প্রসিদ্ধ আড্ডা ছিল। তার একটু কারণও ছিল। কলিকাতা হইতে মুরসীদাবাদের পথ তখন এই গ্রামের উপর দিয়া। এখন গঙ্গা প্রায় দেড় ক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছেন কিন্তু তখন সরকারী রাস্তার পাদ মূলে প্রবাহিত হইতেন। রাস্তার ঠিক উপরে “গেছো সন্ন্যাসীর মঠ” আমার মনে জাগিতেছে, এই মঠ একটু একটু ইতিহাসের গন্ধ বহন করে, অন্ততঃ সেরাজদ্দৌলা চরিত্রের একভাগে কিঞ্চিৎ কিরণ বর্ষণ করে। ঠিক এইস্থানে এক অশ্বত্থ গাছ ছিল, তার উপরে তক্তা পাতিয়া এক সন্ন্যাসী জপতপ করিতেন। অন্ধকূপ ব্যাপারের আগে এই পথে নবাব যখন সসৈন্যে কলিকাতা যান, সন্ন্যাসী তখন তাঁকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল,—“লড়াই ফতে হবে।” ফিরিয়া আসিয়া সিরাজ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই দ্বিতল মঠ প্রস্তুত করাইয়াছেন, তদবধি সন্ন্যাসীকে আর গাছে থাকিতে হইত না। এই মঠের গঠন প্রণালী একটু স্বতন্ত্র। এখন ভগ্নাবস্থা, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায় ইহার মধ্যে তাহার স্নানাহার প্রভৃতির সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ইন্দারার চিহ্ন এখন নাই, কিন্তু তাহা যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁদের কাছে গল্প শুনলাম, আবশ্যক হইলে কখন কখন সন্ন্যাসী লোহার লম্বমান শিকল অবলম্বন করিয়া নাবিয়া আসিত। মরিবার আগে মঠ ছাড়িয়া সে নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে জমীদারদের ঠাকুর-বাড়ীতে আসিয়া বাস করে, সেইখানে দেহত্যাগ করে। কিছু দিন পূর্ব্বে একটা নীলকণ্ঠ পাখী এই মঠের উপরকার গবাক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তার পা লাগিয়া গবাক্ষ হইতে কয় খান মোহর পড়িয়াছিল। ইহার একখণ্ড নমুনা আমি কুলবে-ড়িয়ার জমীদার মহাশয়দের অনুগ্রহে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তার সময় নির্ণয় করার জন্য গালার ছাপ তুলিয়াও আনিয়াছি। আমার শ্রীহস্তাক্ষর দেখিয়া পারসীনবিশেরা মনে করেন বটে আমি প্রায় পারসী লিখি, কিন্তু তোমার বোধ হয় জানা আছে যে পারসীতে আলে বে তে সের বেশী যে আর অক্ষর আছে, এ আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। কাজেই যত দিন না কোন মৌলবী সাহেবের সাক্ষাৎ পাই, ততদিন মোহর রহস্য ভেদ হবে না।

মফঃস্বল ভ্রমণে এবার একটু কাজ হয়েছে। অনেক দিন পর পল্লীগ্রামের পৌষ পার্ব্বণের ব্যাপার দেখে এসেছি। কত দিন পরে! তখনকার সেই বালকতা-টুকু থাক্‌লে বুঝি পৌষ সংক্রান্তির সে মোহনভাবটুকুও পূর্ণমাত্রায় অনুভব করতে পার-তাম। এই বালকতার আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত কবিত্ব অথবা সংসাররৌদ্রতপ্ত যুবা পুরুষের ক্ষণিক চিন্তা বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়, সেই বালকতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখ দুঃখের “মাপকাটির”ও একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হয়েছে। স্থান,

কাল পাত্রকে তখন যে হিসাবে মাপিতাম এখন সে হিসাবে মাপিতে গেলে ভয়ানক অসঙ্গতি দাঁড়ায়। পাড়াগাঁয়ের মাঠের দীঘি দেখে তখন বাস্তবিক অনন্ত দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মিটে যেত, প্রতিবেশীর ক্ষুদ্র আশা ভরসা কার্য্য যা কিছু বল সবার সঙ্গে আত্মহারা হয়ে মিশে যেতে পারতাম।

সে চক্ষু নাই থাক্, কিন্তু এ বয়সেও পৌষ পার্ব্বণ দেখিবার সামগ্রী। বৎসরের অন্যান্য সময়ে বাঙ্গালা দেশ হয় কেবল ধূ ধূ মাঠ, নয় জলে স্থলে খচিত। শস্যশালিনী শ্যামলা বাঙ্গলার পূর্ণ পরিণতি এই পৌষ মাসে,—পৌষ সংক্রান্তি সেই মহা সৌন্দর্য্যের উৎসব। চারিদিকে রবিশস্যক্ষেত্রে হরিৎ সৌন্দর্য্যের মেলা, তার মাঝে মাঝে ক্রমাগত সুপক্ক ধান্যের হিরণ্ময়ী শোভা—যে সৌন্দর্য্যের কাঙাল, তার এত তৃপ্তি আর কোথায় হতে পারে? তার পর বাঙ্গলার দুঃখী নিরন্ন কৃষকের কি আনন্দ! সম্বৎসর পেট পূরিয়া যে খেতে পায় নাই, তারও এখন উদর পূর্ত্তির সম্ভাবনা হয়েছে। সে আশার প্রত্যেক অক্ষর সে শস্য কর্ত্তনের সময় গ্রাম্য গীতি লহরীতে প্রকাশ করিতেছে। বসন্তের বার্ত্তা পেয়ে বৃক্ষলতা কিসলয়ে সাজিয়া কুসুমিত হয়ে উঠচে। কোকিল, দইয়াল পাপিয়া বউকথাকওর আকাশভরা গানের বিরাম নাই।

বাস্তবিক এই সময়ে আমাদের রাজনীতিবিদ্ মহাশয়েরা যদি এক একবার পল্লীগ্রাম পবিত্র করেন, তবে তাঁদের একটু আশা ভরসা হয়। বসুন্ধরা বাঙ্গলার কিসের অভাব? এই সুজলা শ্যামলার সন্তান আমরা, আনন্দের গান না গেয়ে অহোরাত্র কেবলই বিষাদ চীৎকার করে মরি কেন? কোন্ জিনিষটার অভাব তা বল? ঐ শস্য ক্ষেত্রে অনন্ত ধনের ভাণ্ডার, ইক্ষু খেজুরগাছ তোমাদের জন্য মধু বর্ষণ করিতেছে, বাঙ্গলার প্রকৃতি তার সুনীল আকাশ, সবুজ মাঠ, ফুলে ফলে ভরা লতাবৃক্ষের শোভা নিয়ে তোমায় আদর করিতে সদাই প্রস্তুত! অন্যের উপর নির্ভর না করলে চলে না, ব্যাপারটা এতই গুরুতর কিসে—এ সময়ে অন্ততঃ তা বুঝা যায় না।

আমি বলি কি বেশী সহরঘেঁষা হয়ে উঠে, এ সব কথা আমরা ভুলতে আরম্ভ করচি। জীবনের সংগ্রাম যে বিষম ব্যাপার এ পাড়াগাঁয়ে থেকে তা অনুভব করা যায় না। সেটা সুবিধা কি কুবিধা তাও তর্কের বিষয়। মানুষে মানুষে বিবাদ নেই, বিসম্বাদ নেই অথচ অহরহ দ্বন্দ্ব, পরস্পরে পরস্পরকে ঠেলে ফেলে আপনি উঠ্‌তে চেষ্টা করচে এটা কি দেখ্‌তে ভাল? প্রেমের রাজ্য কি শেষে এমনি করে বিস্তৃত হতে চল্ল? অন্য যে জাতির পোষায় পোষাক্, এ জীবন সংগ্রামের কারবার বাঙ্গালীর পোষাবে না। আমার ধারণা এই যে বাঙ্গালীর যেটুকু বাঙ্গালিত্ব তা এ ভাবের ঠিক্ বিপরীত। আসল বাঙ্গালিত্বকে অবলম্বন করে যে মহত্ত্ব জন্মগ্রহণ কর্‌তে পারে, তার গতি এবং প্রকৃতি অন্যরূপ। একান্নবর্ত্তী পরিবার যাদের সংসার ভিত্তি, জীবন-সংগ্রাম তাদের কাছে অর্থহীন ব্যাপার। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের স্নেহ প্রীতির পরিণতিতে কি মহত্ত্ব জন্মাতে পারে না? পরের

বৈকি! সে দিন চৈতন্য তা দেখিয়ে গেছেন। তিনি বাঙ্গালীর সেরা বাঙ্গালী ছিলেন। সংসারকে হরিনাম শেখাবার জন্য তিনি সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করেন, সে সময়ে বৈরাগ্য অবলম্বন না করলে তিনি শক্তির উপাসক বাঙ্গালীকে প্রেমোপাসনা শেখাতে পার্‌তেন না। কিন্তু অত মায়া আর কার্ ছিল বল? অত দাস্য, অত সখ্য, অত বাৎসল্য, অত মধুর প্রেম আর কাতে ছিল বল? মার প্রতি অত ভক্তি, সখাদের উপর অত ভালবাসা, অনুগত ভৃত্যাদির উপর অত দয়া, সাধ্বী প্রিয়তমা পত্নীর উপর অত প্রেম আর কার্ ছিল বল? সংসার ত্যাগের নিশীথে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি সেই প্রগাঢ় অনুরাগের ভাব, তা মনে করে কি স্থির থাকা যায়? তার পর সন্ন্যাসী নিমাইর সঙ্গে শান্তিপুরে শচি মাতার যখন দেখা হলো, তখনকার মাতৃভক্তি একবার স্মরণ কর। মাতৃ অঙ্ক ত্যাগ করে এসেচেন বলে কি অনুতাপ! কিন্তু এই সব স্নেহ প্রীতির পরিণাম কি? তিনি অনন্ত শক্তিকে এই সব প্রেমের নিদান মনে করতে পেরেছিলেন। অত মহত্ব কে লাভ কর্‌তে পেরেছে? কর্ত্তব্য জ্ঞানের কাছে সবই তিনি তুচ্ছ কর্‌তেন এই কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে তিনি তাঁর পরম সুখের সংসার ত্যাগ করেছিলেন, মার স্নেহ এবং দুঃখ, পত্নীর প্রেম এবং বিরহ তাঁকে রোধ কর্‌তে পারে নাই। শান্তিপুরে মাকে বল্‌লেন, "তোমার কাছেই থাক্‌ব মা, কিন্তু এমন আজ্ঞা করো যাতে "কেহ যেন এই বোল না করে নিন্দন।" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন "প্রভুকে বলিও, সবাই তাঁকে দেখিতে চলিয়াছে, আমি একবার চরণ দর্শন কর্‌তেও পাই না কেন?" এই কর্ত্তব্য জ্ঞান এবং মহত্বের অনুরোধে তিনি দয়াময় হয়েও সখাদের শিষ্যদের মিনতি অগ্রাহ্য করে ছোট হরিদাসের মুখ দেখেন নাই।

আমি বলি না যে মহত্ব লাভের অন্য যে চেষ্টা হচ্চে তার প্রয়োজন নাই। সে চেষ্টা হোক্,—নিঃসংশয়ে কোন্ বিষয়ের শেষ পথ কোন্‌টা কে বল্‌তে পারে? কিন্তু আমি বলি কি, বন্যার জলের আবিলতা থেকে বঙ্গসমাজ রক্ষা কর্‌তে হবে। যা কিছু বাঙ্গালিত্বের বিঘ্নকর এবং তার বিপরীত ভাবের প্রতিপোষক, তারই উপর আমাদের সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে।

নানা কথায় তোমায় পৌষ পার্ব্বণের ভোজন পর্ব্বটার কোন কথা বলা হলো না। আর সেই নূতন চালের পিঠে পুলি সরুচাকলি, নলেন গুড়ের পায়স, সহরে পেটে সহিবে, এমন বিশ্বাস আমার নাই। অতএব পৌষ পার্ব্বণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের একটু প্রশংসা করে আমি আজ্‌কের মত "মধুরেণ সমাপয়েৎ" কর্‌ব।

সত্য কথা বল্‌তে কি, আমাদের কুললক্ষ্মীরা যে সত্য সত্যই লক্ষ্মীর বংশ ধাত্রী, পৌষ পার্ব্বণের সময় তা বুঝা যায়। আমরা পুরুষ জাতি কেবল মোট বহিয়াই নিশ্চিন্ত, কিন্তু লক্ষ্মীর আবাহন ক্রিয়া তাঁর বংশধাত্রীরাই নির্ব্বাহ করেন। সংক্রান্তির দিন শেষ রাত্রে শঙ্খ ধ্বনির যে ধুম তা আর কি বল্‌ব? আর তার সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি—"এসো

পোষ যেয়ো না!" ইত্যাদি। ভোর হতে না হতে সেই হী হী শীতে স্নান করেই আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা সে কদিন পাকশালে প্রবেশ করেন, সমস্ত দিন অতিথি অভ্যাগতকে আহার করাতে তাঁদের কষ্ট কি বিরক্তি নাই। এত সহিষ্ণুতা আর কোথায় আছে? তাঁদের চিত্র বিদ্যারও যথেষ্ট পরিচয় এ সময়ে পাওয়া যায়। আলিপনা কি গৃহে, কি প্রাঙ্গণে বাস্তবিক দেখিবার সামগ্রী। সে কদিন বাঙ্গালী গৃহে বড় শোভা। বিশেষ জ্যোৎস্না রাত্রে প্রাঙ্গণের আলিপনায় কেমন একটু বচনাতীত সৌন্দর্য্য হৃদয় স্নিগ্ধ করে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বাঙ্গালীর গান।

কবি বলেন কাব্যই সার, গানই মানুষের হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস। হৃদয় হইতে ছন্দোময় গীত উচ্ছসিত হইয়া বাহ্য জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সঙ্গীতেই মনুষ্যের বারতা প্রচারিত হয়। বৈজ্ঞানিক বলেন নিয়ম ভিন্ন কিছুই হয় না, নিয়মের শৃঙ্খলেই এই বিশ্বজগৎ বদ্ধ রহিয়াছে।

যিনি যাহাই বলুন এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে জগতে যে সকল মহাবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে তাহা অধিকাংশ ছন্দগ্রথিত। কাব্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া যে কথা আমাদের হৃদয়ে আজিও প্রবেশ করিতেছে তাহা কবির কথা। বাল্মীকি ব্যাস কালিদাসকে ছাড়িলে আমরা নিতান্তই দরিদ্র হইয়া পড়ি, হোমর সেক্ষপীয়রকে ছাড়িলে ইয়োরোপের ঐশ্বর্য্য অল্পই অবশিষ্ট থাকে। জগতের এই যে মহা সঙ্গীত এই যে কালবিজয়ী গান, ইহাতে বাঙ্গালী কখন যোগ দিতে পারিবে কি? এমন কথা কখন কি বাঙ্গালীর মুখ দিয়া বাহির হইবে যে সেই কথা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য জগতের অন্যান্য জাতি কাড়াকাড়ি করিবে?

মহা কবি কখন্ জন্মগ্রহণ করেন, মহাবাক্য কখন্ উচ্চারিত হয়? মনুষ্য জাতি সমুদ্র বিশেষ, সেই সমুদ্র মথিত হইলে তবে তাহা হইতে অমৃত উঠে। মনুষ্য সমাজ এইরূপ অনেকবার মথিত হইয়াছে, অনেকবার অমৃত উঠিয়াছে। অনেক মানুষের হইয়া যখন একজনে কথা কয়, অনেক মানুষকে শুনাইবার জন্য যখন একজন কোন সংবাদ লইয়া আসে, তখন সেই কথা অমৃততুল্য, সেই কথার বিনাশ নাই। বহু দুঃখে কিম্বা বহু সুখে বহু দিন পরে এমন বাক্য নির্গত হয়। বাঙ্গালী কি এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছে যে তাহার আকুল হৃদয় মথিত হইয়া অমৃত-মণ্ডিত কোন সঙ্গীত বাহির হইয়া পড়িবে?

বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সুকবি অনেক হইয়াছেন। ইনি আমাদের বায়রণ, ইনি আমাদের পোপ, ইনি আমাদের শেলি, এমন কথা অনেক শুনিতে পাই। কিন্তু ইনি

আমাদের কবি, সমগ্র জাতির অহঙ্কারের সামগ্রী, জগতের একটী শ্রেষ্ঠ রত্ন, এ কথা এখনো শুনিতে পাই নাই। এ কথা শুনিবার এখনো সময় হয় নাই।

স্বাধীনতা, পরাধীনতা এ সকলে কিছুই আসিয়া যায় না, আমাদের চিত্ত স্বাধীন, আমাদের মন বাঁধিয়া রাখে এমন সাধ্য কাহারও নাই, অতএব পরাধীন থাকিয়াও বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে অমর-সঙ্গীত প্রবাহিত হইতে পারে, এ কথা আমি কখন মানিব না। পরাধীন থাকিয়াও যে মহাবাক্য বলা যায় না এমন কথা বলি না, কিন্তু অবস্থা বিশেষে যে কিছু আসে যায় না, এরূপ কথা স্বীকার করিব না। বাল্মীকি ব্যাস এ পর্য্যন্ত আর আমরা কেহ দেখিতে পাইলাম না? কারণ যে স্বাধীনতা তাঁহাদের ভিতরে বাহিরে ছিল তেমন স্বাধীনতা আর এ ভারতে হয় নাই। স্বাধীন আর্য্যাবর্ত্ত, স্বাধীন হিমালয়, স্বাধীন অরণ্য, স্বাধীন বিহঙ্গ, স্বাধীন হিন্দু, সম্পূর্ণ স্বাধীন ঋষি, তেমন অদ্যাবধি আর দেখা যায় নাই। তেমন পবিত্র, মুক্ত, গভীর চিন্তা, তেমন বিশাল সহৃদয়তা, তেমন একাগ্রতা, তেমন স্বাধীনতা, তেমন স্বভাব-সৌন্দর্য্য, আর কখন একত্রিত হয় নাই, এই জন্য আর কখন ব্যাস বাল্মীকিও জন্ম গ্রহণ করেন নাই। আবার সেইরূপ ঘটনা সমূহের সমবায় হইলে আবার তেমনি আকাশস্পর্শী কল্পনা মানব জাতির আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। মিসর দেশে ইহুদী জাতি দাসত্বের চক্রে পিষ্ট হইল, তাহার ফল যীশু খৃষ্ট। গ্রীসের বীর্য্য, গ্রীসের সৌভাগ্য হোমারে চিত্রিত রহিয়াছে। আজ যে ইংরাজ সসাগরা পৃথিবীর রাজা, সেক্ষপীয়র সেই রাজমুকুট ধারণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ-পীড়িত ভারতবর্ষের মধ্যে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সমুদ্র মন্থন না করিলে কি কখন অমৃত উঠে?

বাঙ্গালীর কি এখনো কিছু হয় নাই? না হইলে চৈতন্যের সেই অশ্রুপূর্ণ, উৎফুল্ল-কমল সদৃশ মুখমণ্ডল, তাঁহার সেই তেজঃপুঞ্জ দেবকান্তি কি আজ আমরা পৃথিবীর সম্মুখে ধরিতে পারিতাম? বাঙ্গালীর উপর যখন মুসলমানে বড় অত্যাচার করে, শোকে দুঃখে যখন বাঙ্গালীর হৃদয় অস্থির হইয়া উঠে, তখন না সেই মথ্যমান সমুদ্র হইতে চৈতন্য দেব উদিত হইলেন! চারিদিকে দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখে ভরিয়া গেল, সেই বিশাল চক্ষুযুগল হইতে যে স্রোত ছুটিল, সেই স্রোতে বঙ্গদেশ ডুবিয়া গেল। তাঁহার পবিত্র অশ্রুজলে সিঞ্চিত কোন মহাছায়া বিশাল তরু কি জগৎকে আশ্রয় দিবে না, তাহার সুশীতল ছায়ায় কি শ্রান্ত পথিক দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া বিশ্রামের জন্য একটু বসিবে না? এমন কথা যেন বাঙ্গালীর মুখ হইতে কখন না বাহির হয়।

বহুদূরে বসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে স্বদেশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি। দেখিতেছি চারিদিকে কোলাহল, চারিদিকে আন্দোলন,—সমুদ্র চঞ্চল হইয়াছে। নানা দিক হইতে নানা রকমের স্রোত আসিয়া মিশিতেছে, অসংখ্য লোকে স্রোতের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া যাই-

তেছে, অসংখ্য লোকে আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতেছে, কতক লোকে স্রোতের সঙ্গে ঘুরি-তেছে। কোলাহলটা বড় বেশী, কে কি বলিতেছে ভাল শোনা যায় না, সকলেই প্রাণপণে চেঁচাইতেছে, সকলেই আর সকলের কথা ডুবাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইংরাজি সংবাদ পত্র লেখকেরা বলিতেছেন বাঙ্গালা লিখিয়া কি হইবে, বাঙ্গালার কলমের জোর হয় না; বাঙ্গালা লেখকেরা বলিতেছেন, হৃদয়ের কথা বাঙ্গালায় নহিলে কি অন্য ভাষায় বলা যায়, ইংরাজির সমুদ্র হাতনাড়া দিয়া কি তোমরা ক্ষুব্ধ করিতে পারিবে? এক দলের এক ধূয়া, আর এক দলের আর এক ধূয়া। এক দল মাটি আনিয়া দিতেছে, আর একদল সেই মাটিতে পুঁতুল গড়িতেছে, আর যাহারা মাটি আনিয়াছে তাহাদের গালি পাড়িতেছে। দুঃখ অভাব চারিদিকে, চারিদিকে লোকের কষ্ট বাড়িতেছে, অন্ন দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, লোকে আকুল হইয়া পড়িতেছে। সমুদ্র মন্থন বুঝি বা আরম্ভ হয়।

এখন যাহা হইতেছে তাহা থাকিবেনা। ইংরাজি সংবাদ পত্রই বল আর বাঙ্গালা মাসিক পত্রই বল, বাঙ্গালির সংবাদ, বাঙ্গালীর গান কোথাও পাইবে না। আবশ্যক দুয়েরই আছে, দুয়ের মধ্যে অমর-বাণী কোথাও নাই। বাঙ্গালী একা থাকিয়া কিছু করিতে পারিত না, ইংরাজ আসিয়া তাহার দশা ফিরিয়াছে, তাহার মুখের ভাব আর-এক রকম হইয়াছে। এখন আবার ভারতবর্ষের অন্য জায়গা হইতে স্রোত বহিয়া বঙ্গদেশে যাইতেছে। বাঙ্গালীর গান ভারতবর্ষের গান হওয়া চাই, তবেই সে গান টিঁকিবে। ভারতবর্ষের এত দুর্দ্দশা হইলেও একতা একেবারে কখন নষ্ট হয় নাই। আচার ব্যবহার বেশ ভূষায় হাজার প্রভেদ থাকিলেও প্রাণের ভিতর একটা মিল আছে। এই বহু জাতির হৃদয় অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া যে গান গাহিবে, তাহা বঙ্গদেশেই গীত হইবে। সেই আমাদের গান।

আমরা তবে কি করিতেছি? আমরা সিংহাসন রচনা করিতেছি, বাঙ্গালীর কবি সেই সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিবেন। আমাদের মাথায় পা রাখিয়া তিনি যে গান গাহিবেন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সেই গান ধ্বনিত হইবে। সিংহাসনের জন্য কেহ সোনার জিনিষ যোগাইতেছে, কেহ গিল্‌টী-করা বই আর কিছু পায় নাই, তাহাই আনিতেছে। সিংহাসনের সৃজনে যাহা কাজে লাগিবে না তাহা তলায় পড়িয়া থাকিবে। আমরা যে যাহা পারি আনিয়া জড় করিতেছি। যে সমুদ্রে আমরা বিন্দু সেই সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত বিলোড়িত হইয়া, সেই সমুদ্র মথিত হইয়া যে অমৃতময় বাক্য বাহির হইবে তাহাই বাঙ্গালীর গান।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

হাসি।

আমার মুখের দিকে তোমরা একবার তাকাও; আমি বড় সুন্দর। আমার সৌন্দর্য্য আমি লুকাইয়া রাখিতে পারি না, তাই সকলকে ডাকিয়া বলি, তোমরা আমায় দেখ। আমার সুখ আমি একেলা ভোগ করিতে পারি না, সকলকে বিতরণ করিতে ভালবাসি।

গোজ-করা মুখ আমার সয় না, আমার বিকাশে শোক দুঃখ দূর হইয়া যায়। যে আমায় দেখে তাহার হৃদয় সরোবরে তরঙ্গ উঠে। আমি চঞ্চল, খেলা বই আমার অন্য কাজ নাই। আমি তোমাদের চোকে, মুখে, হৃদয়ে খেলিয়া বেড়াই!

সব সৌন্দর্য্য আমাকে লইয়া। আমি না থাকিলে রূপ হয় না। ফুল যখন ফোটে তখন আমি তাহার হৃদয়ে গিয়া বসি, নদী যখন বহে তখন আমি তাহাকে নাচাই, বায়ু আমাকে লইয়া লোফালুফি করে, আমার পিছনে দৌড়িয়া বেড়ায়। বালক বালিকার মুখে আমি যেমন শোভা পাই এমন আর কেহ নয়। তরুণীর আমা বই অন্য উপায় নাই, ধার্ম্মিকের অধরে আমিই বিরাজ করি।

কত আমার বয়স হইল তবু আমি শিশু। কাল তাহার শুভ্র জটাভার লইয়া আমার কাছে আসে। বুড়া আমায় দেখিয়া হাসিয়া পালায়। আমায় কি সে আঁটিয়া উঠিতে পারে?

আমিই ত প্রকৃতির শোভা, আমিই সূর্য্যের আলোক, আমিই অন্ধকার নাশ করি, আমিই চন্দ্রের কোল উজ্জল করি। পাখীর গান ত আমারই সুর। প্রভাতের আকাশ ত আমারই ছবি, সন্ধ্যার লোহিত মূর্ত্তি ত আমারই মায়া।

নিত্য সনাতন আমি, আমার আবার কত অনুকরণ, কত ঝুঁটা প্রতিমূর্ত্তি আছে। কাষ্ঠ হাসি, চড়ুকে হাসি, ঠাটের হাসি, জাঁকের হাসি, মূঢ়ের হাসি কতই ভণ্ড আমার আসনে বসিতে চায়। তাহাদের দেখিয়া কেহ ভুলিও না। আমি ত এক, আমার ত একই নাম। যখন আমায় দেখিয়া তোমাদের হৃদয়ের কবাট মুক্ত হইয়া যাইবে তখনি বুঝিবে আমার দেখা পাইয়াছ। আমি স্বচ্ছ, সরল, শিশুস্বভাব, খলকপট শূন্য।

আমি কি শুধু আনন্দ? কি গভীর শোক দেখ আমার মর্ম্মে নিহিত রহিয়াছে! শোকের গভীর মর্ম্ম না জানিলে আমার এত আনন্দ কিসে? অথচ শোক আমার চিরশত্রু, তাহাকে না তাড়াইলে আমার বাস উঠাইতে হয়। কিন্তু তাহাকে আমি কেমন করিয়া তাড়াই? আমার আর কোন উপদ্রব নাই, আমি শুধু তাহাকে আমার বুকের ভিতর টানিয়া লই। সেই আলোকময় অতলে সে ডুবিতে থাকে, আমি বিদ্যুতের মত ত্রিজগৎ ভ্রমণ করি।

আমার কি কোন ভাবনা চিন্তা নাই? আছে বৈ কি। কোন্ শুষ্ক হৃদয়ে আমার

সুশীতল বারিবিন্দু সিঞ্চন করিব, কাহার চক্ষের জল মুছাইব, কোন্ অন্ধকার ঘরে ফুটিব, কোন গাছের মুকুলে, কোন পাখীর কণ্ঠে বসিব, কোন কবির প্রাণে প্রবেশ করিয়া মহাহর্ষ সঙ্গীত গান করিব, নিত্য তাই ভাবি। ভাবনায় কখন আমার মুখ মলিন হয় না, আমি যাহার কপালে চিন্তারেখা অঙ্কিত করি তাহার শিরে জ্যোতি জ্বলে।

কে বলে শোকসন্তাপ জগতের নিয়ম? শোককে লইয়া তোমরা কয়দিন ঘর করিতে পার? আমাকে কদিন বিদায় করিয়া দিয়া থাকিতে পার? আমিই ত নির্ম্মল আকাশ, শোক তাহাতে মেঘ মাত্র। আমি ফুৎকার দিলেই সে মেঘ উড়িয়া যাইবে।

তোমাদের জীবনে সুখ আমিই, ধর্ম্মে আমি পবিত্রতা, বিশ্বাসে আমি বল। বিশ্ব-জগৎ নিয়ন্তার আজ্ঞা আমি, সৃষ্টির আদিরূপ আমি, অনন্ত জীবনের ধারা আমি, আমিই মৃত্যুঞ্জয়। মানুষকে আমিই অমর করি, আমি তাহার মনের মালিন্য মোচন করি। আমি নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ, পবিত্র, জ্যোতির্ম্ময়।

অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রের পশ্চাতে আমিই না দাঁড়াইয়া থাকি? আমিই না ক্ষুদ্র পদবিক্ষেপে অন্ধকারের বিশাল নীরব প্রকোষ্ঠ ধ্বনিত করি? অসাড় অচেতন মহাকায় অন্ধকারের স্তব্ধ ধমনীতে আমিই না শোণিতরূপে প্রবেশ করি? আমারই চঞ্চল পদক্ষেপে অন্ধকারে আলোকের তরঙ্গ ওঠে।

আমি না কি ক্ষুদ্র'তাই ক্ষুদ্রের কাছে থাকিতে বড় ভাল বাসি। তাই আমি শিশুর ঠোঁট দুখানির মধ্যে আপনার বাসস্থান রচনা করি, তাহার চোকের চারিদিকে ছুটা-ছুটি করি।

আর এই চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র? ইহারাও ত শিশু, ঐ ক্ষুদ্র বালকটীর মত শিশু। এই জীর্ণজরা প্রাচীন পৃথিবী ত সেদিনকার শিশু। আমাকে আশ্রয় করিয়াই ইহারা চিরশৈশবে রহিয়াছে।

অহঙ্কার? আমার সৌভাগ্য গর্ব্ব নাই। কেমন করিয়া আমার অহঙ্কার থাকিবে, কিসের অহঙ্কার? আমি যে নিজেকে দেখিয়া হাসিয়া কুটিকুটি হই। আমি যে হাসি।

তোমরা আর কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দিও না, আমাকে তোমাদের হৃদয়ের রাজা কর। আমি তোমাদের সকল সাধ মিটাইব। আমার মত রত্ন কোথাও পাইবে না।

দুঃখী, তাপী, শোকে সন্তপ্ত যে যেখানে আছ, আমার মুখের পানে তাকাও। আমায় যে ডাকে সেই আর সব ভুলিয়া যায়। আমি তোমাদের সকল দুঃখ হরণ করিব। যাহা কিছু শোক দুঃখ আছে সে সকল আমাকে দাও, আমাকে তাহার বিনিময়ে গ্রহণ কর। আমি তোমাদিগকে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পন করিতেছি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৫২২

বৃষ্টি।

একটি পাত্রে যখন জল গরম করা হয় তখন উত্তাপের তরঙ্গ পাত্র ভেদ করিয়া পাত্রমধ্যস্থ জলকে খুব করিয়া নাড়া দিতে থাকে। প্রথমে পাত্রের তলার দিকের জল-কণা সকল উত্তাপের প্রভাবে ইতস্ততঃ নড়িতে থাকে ও নাড়া খাইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। এইরূপে তাহারা হাল্কা হইয়া উপরকার অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জলের স্তরের উপর ভাসিয়া উঠে। উপরকার জল নীচে নামিয়া গরম হইয়া আবার উপরে উঠিয়া পড়ে। এইরূপ যখন জল ক্রমাগত উঠা নামা করিতে থাকে তখন আমরা বলি জল ফুটিতেছে। জলের বেগ ক্রমেই বাড়িতে থাকে, জল ক্রমেই অধিকতর গরম হইতে থাকে, অবশেষে জলকণার পরমাণু সকল পৃথক হইয়া অদৃশ্য বাষ্পাকারে উঠিতে থাকে। আগুনে চড়ান গরম জল-পাত্র হইতে যখন বাষ্প উঠিতে থাকে তখন একটু মনোযোগ করিয়া যদি দেখা যায় ত দেখিতে পাইবে যে ঠিক জলের অব্যবহিত উপরেই বাষ্প দেখা যায় না। তাহার কারণ, জলের ঠিক উপরেই এত তাত বেশী যে জলীয় পরমাণু সকল জমাট বাঁধিয়া বাষ্প আকার ধারণ করিতে পারে না। আরেকটু উপরে উঠিয়া যখন অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুর সংস্পর্শ হয় তখন সেই বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলি পুনশ্চ একত্রে আকৃষ্ট হইয়া অতি সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণাগুলিই বাষ্প। টিণ্ডাল সাহেব ইহার নাম রাখিয়াছেন জলরেণু।

পৃথিবী একটি বৃহৎ জলপাত্র। সূর্য্য কিরণের তাপ পাইয়া ইহার জল পরমাণু সকল পৃথক্ হইয়া উঠিতে থাকে। বায়ু-অণুর মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করে। এই জল-পরমাণু সকল বায়ু অপেক্ষা অনেক লঘু—সুতরাং যখন বহুল পরিমাণে জল-পরমাণু পৃথিবীর অব্যবহিত উপরকার বায়ুস্তরের মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাহা ঊর্দ্ধ বায়ুস্তরের অপেক্ষা হালকা হইয়া জল-পরিমাণু-সমেত উপরে উঠিয়া যায় এবং ঊর্দ্ধ বায়ুস্তর নিয়ে আসিয়া জল-পরমাণু সঞ্চয় করিতে থাকে। এইরূপে নিঃশব্দে বিনা গোলযোগে পৃথিবীর জল আকাশে উঠিতে থাকে। গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, ভারত মহা-সমুদ্র হইতে বৎসরে প্রায় বাইশ ফিট জল আকাশে উবিয়া যায়।

পূর্ব্ব সংখ্যক বালকে প্রকাশিত "বায়ুস্তরের চাপ" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, যে উপরকার বায়ুর চাপ পড়াতে ভূতলের নিকটবর্ত্তী বায়ু অপেক্ষাকৃত ঘন সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং ভার না থাকাতে উপরকার বায়ু অনেকটা পৃথক এবং লঘু হইয়া থাকে। জল-পরমাণু বহন করিয়া বায়ুস্রোত যখন উপরে উঠিয়া যায় তখন চাপ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার পরমাণু ছড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং এইরূপে তাহাদের সঞ্চিত উত্তাপ অনেকটা বাহির হইয়া যায়—সুতরাং বাতাস অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হইয়া যায়। বাতাস ঠাণ্ডা হইলেই অমনি তাহার জল পরমাণুগুলি বাষ্প আকার ধারণ করে। এই বাষ্পই মেঘ।

কোন কোন সময়ে বাতাস যখন বিশেষ গরম থাকে তখন হয়ত মেঘ আর বাঁধেই না। এইরূপ মেঘশূন্য গরম দিনে বাতাস অদৃশ্য জল পরমাণুতে একেবারে পূর্ণ থাকে। এমন সময়ে যদি সহসা ঊর্দ্ধ আকাশে শীতল বায়ুস্রোত আসিয়া উপস্থিত হয় ত অমনি দেখিতে দেখিতে মেঘ জমিয়া আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

মনে কর এইরূপ যখন আকাশে মেঘ করিয়া আছে এমন সময় অত্যন্ত শীত বায়ু অথবা সজল বায়ু সেই মেঘের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল—যদি শীতবায়ু হয় ত ঠাণ্ডায় জলরেণু গুলি অধিকতর ঘন আকৃষ্ট হয়, আর যদি সজল বায়ু হয় ত বাতাসে এত বেশী জল জমে যে বাতাস তাহা আর বহন করিয়া রাখিতে পারে না। দুটার মধ্যে যেটাই হোক জলরেণু বড় বড় বিন্দুতে পরিণত হয় তার পরে পৃথিবীর জল পৃথিবীতেই আসিয়া পড়ে।

বৃষ্টি পড়িবার আর এক উপায় আছে। জলপরমাণুপূর্ণ বাতাস পর্ব্বতের শীতল শিখরের গাত্র স্পর্শ করিলে পর শীতল হইয়া বৃষ্টি হইয়া পড়ে। বঙ্গোপসাগরের তীরে খাসিয়া পর্ব্বত শ্রেণী আছে। ভারতসাগর হইতে বাতাস আসিয়া সেই পর্ব্বতের গাত্রে গিয়া লাগে। আঘাত পাইয়া বায়ু প্রসারিত হইয়া শীতল হয় ও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এই কারণে খাসিয়া পর্ব্বতের দক্ষিণ প্রান্তে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি পড়িয়া থাকে কিন্তু তাহার অপর প্রান্তে বৃষ্টি নাই বলিলেই হয় অর্থাৎ সমস্ত জল এক প্রান্তেই প্রায় নিঃশেষে ঝরিয়া পড়ে।

চতুর্দ্দশ বর্ষের বালক।

আহা দেখ! ঐ সমাধি ক্ষেত্রে কোন্ মহাত্মার পবিত্র দেহ নীত হইতেছে। পাঠক, পাঠিকা! আপনারা সচরাচর যে অর্থে "মহাত্মা" শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেই অর্থে উহা এক্ষণে ব্যবহৃত হইতেছে না। বুদ্ধি, বল, ধর্ম্ম বা কোন প্রকার প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে আমরা প্রায়ই মহাত্মাখ্যা দিয়া থাকি, কিন্তু এই আখ্যায়িকার চরিত্রটি ঠিক সেরূপ নয়। ইনি নিউটন্‌ও নন, লুথারও নন, বেকনও নন, কালিদাসও নন। বলিতে কি, বিত্তশালী লোকদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেরূপ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহার মৃত্যুতে তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। আমাদিগের দেশে কোন বড় লোকের মৃত্যু হইলে দেশশুদ্ধ লোকে বিষণ্ণবদনে শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হন; চন্দনকাষ্ঠে শব দাহ হয়; দরিদ্রদিগকে টাকা পয়সা দান প্রভৃতি মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের দ্বারা সাধু

কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। য়ুরোপ ও আমেরিকার সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, দেশের সমস্ত বড় লোক শব-শকটের অনুসরণ করিয়া থাকেন; রাজমার্গ বড় বড় শকটে পরিপূর্ণ, ক্ষণেক কালের নিমিত্ত বাণিজ্য ব্যবসায়াদি প্রাত্যহিক কার্য্য গুলি বন্ধ থাকে। আজ ইহার মৃত্যুতে সে সকল তো কিছুই নাই—একখানি অতি সামান্য শব-শকট, এবং তাহার পিছু পিছু শুদ্ধ একখানি শকট। তবে ইনি কিসে বড় লোক, আমরাই বা কেন ইঁহার এত আদর করিতেছি? পাঠক, পাঠিকা! একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, পরে জানিতে পারিবেন। যে যে গুণে মনুষ্য যথার্থ মহত্ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়, সেই সেই গুণ ইহাঁতে ন্যস্ত ছিল। সুতরাং ইনি যে মহৎ সাধু ও পবিত্র সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সমাধি ক্ষেত্রে ইহার মৃত দেহ নীত হইতেছে। পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানি গাড়ি ধীরে ধীরে যাইতেছে। সে গাড়িতে কে? মৃত মহাত্মার চারিজন বন্ধুমাত্র, বালক চতুষ্টয়। বন্ধু বিয়োগে ইহাদিগের যে শোক, তাহা অকৃত্রিম শোক—হৃদয়ের অন্তরতম কন্দর হইতে প্রবাহিত হইতেছে। কোনও বড় লোক লোকান্তরে গমন করিলে বাহ্যাড়ম্বরের সহিত লোকে সাধারণতঃ যে প্রকার শোক প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাতে ইহাতে অনেক প্রভেদ। তাহাতে আড়ম্বরই সব, ইহা আড়ম্বরশূন্য। এই শোকে অভিভূত হইয়া আজ শত শত নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা জো ফ্লানিগ্যানের জন্য অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছে। সম্বাদপত্র বিক্রেতা বালক জো ফ্লানিগ্যান লৌকিকীলীলা সম্বরণ করিল তাহার জন্য এত লোক ক্রন্দন করিতেছে! অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে; তাহা না হইলে কেহ কখনও তো সামান্য দরিদ্রের জন্য দুঃখ করেনা। প্রত্যহ কত গরিবের ছেলেরা মরিতেছে, কৈ, কাহার জন্য তো কেহ কিছু মাত্র দুঃখ করে না। তবে আজই বা কেন লোকে অতি দীনহীন ও পিতৃমাতৃহীন বালকের জন্য এত কাঁদিতেছে? সে কি করিয়াছে, আর তাহার কি গুণেই বা সাধারণে এত মুগ্ধ হইয়াছে?

দুই বৎসর গত হইল নিউইয়র্ক নগরে বালক জো প্রথমে আসে। সে খর্ব্ব ও ক্ষীণকায় ছিল। চক্ষু দুটি বৃহৎ ও কটা; মুখ সর্ব্বদা হাসিমাখা। সে কোথা হইতে আসিয়াছিল, কেহ জানে না, জানিতে যত্নবানও হয় নাই। তাহার জীবন বড় কষ্টের। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া পথিমধ্যে বৃক্ষতলে বা বাণিজ্য দ্রব্যাদির বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাক্সে অনির্ব্বচনীয় নিদ্রা সুখানুভব করিয়া সে প্রত্যহ প্রত্যুষে ৪ টার সময় উঠিত। বালকেরা প্রথমতঃ তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ বালকবৃন্দ তাহার সংবাদ পত্রগুলি চুরি করিত, রাত্রিকালে উষ্ণস্থান (হিমপ্রধান দেশে বা শীতকালে উষ্ণ স্থান স্বাস্থ্যোপযোগী) হইতে তাহাদিগের দ্বারা দূরীকৃত হইত, তবু জো কখনও কাহাকে একটি মাত্র কথা বলে নাই। অশ্রুরাশিতে নয়নযুগল পূর্ণ

হইত, কিন্তু তদণ্ডেও সে সমস্ত মুছিয়া জো অন্য দিকে মনঃসংযোগ করিত। এইরূপ আচরণে কে না বন্ধু লাভ করিতে পারে! বলা বাহুল্য যে, অল্প দিনের মধ্যে তাহার অনেক বন্ধু হইল; এখন আর কেহ তাহাকে কোন রূপ বিদ্রূপ করিতে সাহস করিত না! সুহৃৎবর্গকে সে কখনও বিস্মৃত হয় নাই, শত্রুগণের প্রতি সে সর্ব্বদা ক্ষমা-বান ছিল। কোন কোন দিন সংবাদপত্র বিক্রয় করিয়া সে বেশ উপার্জ্জন করিত। হৃদয়বান্ লোকে তাহাকে দয়া করিতেন, ও আবশ্যক হউক বা নাই হউক তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা তাহার নিকট হইতে কাগজ ক্রয় করিতেন। কিন্তু তাহার হাতে একটী পয়সাও থাকিত না। সে এক রাত্রির বাসা খরচও বাঁচাইতে পারিত না, তাহার কারণ এই যে সে কাহারও দুঃখ দেখিতে পারিত না, কোন বালকের আহার না জুটিলে সে তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্রটি করিত না। এইরূপে তাহার প্রতিদিনের উপার্জ্জন দয়ার কার্য্যে ব্যয় হইয়া যাইত।

কিন্তু কঠিন পরিশ্রমে ও বাতাতপ নিবন্ধন জোর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। দেহ দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার প্রীতিময় মুখশ্রী বিশীর্ণ হইল না। অসন্তোষ যে কি জিনিষ সে কখনও জানে নাই। মৃত্যুর দুই সপ্তাহকাল পূর্ব্বে সংবাদ পত্রা-বলীর "অতিরিক্ত সংখ্যা" বিক্রয় করতঃ অতিশয় পরিশ্রমের পর সে এক দিন এক পা নড়িতে পারিল না। সকলে অনুসন্ধিৎসু হইল "জো কোথায়?" কেহ তাহাকে গত রাত্রি হইতে দেখে নাই, সুতরাং কিছু বলিতে পারিল না। অবশেষে তাহাকে একটি নিভৃত স্থানে দেখা গেল; একজন সদ্ভাবসম্পন্ন শকটচালক অনেক অনুনয়ের পর তাহাকে ফ্লাটবুশ নামক স্থানের হাঁসপাতালে লইয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে সে একবার ফ্লাটবুশে অবস্থিতি করিয়াছিল। প্রতি দিন একজন না একজন বালক তাহাকে তথায় দেখিতে যাইত। এক দিন শনিবার অপর একজন সংবাদপত্র বিক্রেতা বালক, যে আগে তাহার প্রতি অনেক অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল এবং এখন যাহার সহিত তাহার প্রণয় হইয়াছিল, সে তাহাকে কুটীরে লেপ গায়ে ও তাহাতে হাতদুটি রাখিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। এই বালকের নাম জেরি ছিল। জেরিকে সম্বোধন করিয়া সে অনেক কষ্টে বলিল "আমি ভাবিতেছিলাম পাছে তুমি না আইস, তোমাকে একবার দেখিবার আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল; জেরি! আমি অনুমান করি এই শেষ দেখা, কারণ, আজ আমি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি! জেরি! আমি মৃত্যুকালে হাত ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি সৎ হইও। অপর অপর বালকদিগকেও আমার কথা বলিও।" এই বাক্যালাপের কিয়ৎকাল পরে জোর মৃত্যু হয়। সব জালা যন্ত্রণা দূর হইল, কিন্তু মুখের প্রীতিময় ভাব যেন মুখেই রহিল,—মরিয়াও যেন হাসিতেছে।

সেদিন জেরি যে সংবাদ তাহার বন্ধুবর্গকে জানাইল তাহা অতিশয় শোকাবহ। তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে, জোর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী তজ্জন্য তাহারা উদ্বিগ্ন চিত্তে

জেরির মুখ চাহিয়াছিল। তাহার অশ্রুবিকৃত মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া জানিতে পারিল যে, জো তাহাদিগকে ফেলিয়া স্বর্গধামে পলায়ন করিয়াছে। শোকের আবেগে কেহ কাহাকেও একটিও কথা বলিতে পারিল না।—তাহারা ভাবিল যেন তাহারাও শমনের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছে।

যে দিন এই মৃত্যু সংবাদ সংঘোষিত হইল, সেই দিন রাত্রিকালে শত শত বালক জোর সম্মানার্থে ও দুঃখ প্রকাশার্থ সিটি হল নামক রাজকীয় প্রাসাদের সম্মুখে সমবেত হইল। চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সমাধি ক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রেরিত হইল। সেই শকট চালক যে জোকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছিল, সেই আবার এই প্রতিনিধিদিগকে একটি কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া লইয়া গেল। পরদিন জো মেদিনী ক্রোড়ে শয়ন করিল। দেশের প্রথানুসারে বালক মাত্রে 'কফিনে' নিক্ষেপ করিবার জন্য একএকটি পুষ্প প্রেরণ করিয়াছিল। বালকেরা চাঁদা করিয়া একটি ধাতু ফলক ক্রয় করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত সরল ভাব পূর্ণ কথা গুলি খোদিত করাইয়া তাহা 'কফিনে' সন্নিবিষ্ট করিয়াছিল।

ছোট জো, বয়স ১৪,
নিউইয়র্কের অত্যুত্তম সংবাদ পত্র বিক্রেতা।
আমরা সকলে তাহাকে ভাল বাসি।

উল্লিখিত বিবরণটি সত্য। ইহাতে কিছুমাত্র মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নাই। নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড নামক সংবাদ পত্র হইতে আমরা এই বৃত্তান্তটি গ্রহণ করিলাম।

পুলের ধারে।

চাঁদ উঠিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র পৃথিবীতে জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিতেছে। সহরের বড় বড় বাড়ীগুলি যেন স্নানের পর শুভ্র নববস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতেছে। আর গঙ্গার জলে চন্দ্র কিরণ পড়িয়া তাহাকে কি চমৎকার সাজাইয়াছে! তাহার ছোট ছোট তরঙ্গগুলি যেন এক একটী জ্যোৎস্নার ঢেউ। জলের সঙ্গে যেন গঙ্গার কোনও সম্পর্ক নাই—সবই জ্যোৎস্না। দুই পার্শ্বে বড় বড় জাহাজের মাস্তলগুলা চাঁদের দিকে দীর্ঘ হাত বাড়াইয়া আছে। মাঝখানে পুলটা যেন একটা বৃহৎ অজগর সর্প পড়িয়া রহিয়াছে—হিমে তাহার শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, নড়িতে চড়িতে পারিতেছে না। রজনী যেন এই পুলটার বুকের পরে তাহার সমস্ত ভর দিয়া স্থির দাঁড়াইয়া আছে। আজ এই পুলের এক ধারে দাঁড়াইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যের মিলন দৃশ্য দেখিতে বড় চমৎকার! পৃথিবীর সহিত চাঁদের স্নেহ মিশিয়াছে, আর পৃথিবীর সন্তানগণের হৃদয়ের প্রেম তাহাতে গিয়া